'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' চতুর্থ সংখ্যা

কারিগরের বাহাদুরি

বিজ্ঞান ভিক্ষু

বেঙ্গল মাস এডুকেশন সোসাইটী
৯৯।১এফ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায় এম, এস-সি
১১।১এফ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার
কলিকাতা

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রিন্টার—শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পুস্তকমালার চতুর্থ পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইংরাজি ভাষায় এরূপ ধরণের বহু পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক একেবারে নাই বলিলেই চলে। দেশের ছেলে মেয়েদের হাতে এরূপ পুস্তক তুলিয়া দিলে তাহাদের মনে বিজ্ঞান বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগিতে পারে এই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকমালা পরিকল্পিত হইয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতির ফলে কারিগুরির বাহাদুরি বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রয়োজনের অনুরোধে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। কারিগরের প্যাঁচে পড়িয়া জড় বুদ্ধিমান জীবের মত কাজ করে। এই পুস্তকে দুই চারিটি মাত্র কারিগরের বাহাদুরির পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল।

এই পুস্তকের আগাগোড়া প্রুফ্ আমার বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয় দেখিয়া দিয়া আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি তিনি না দেখিয়া দিলে এত শীঘ্র বাহির হইত কি না সন্দেহ। ইতি—

শ্রীপঞ্চমী,
১৯ মাঘ, ১৩৪৭

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় — পাতার সংখ্যা

১। ভূতের উৎপাত ... ১
২। চীনের প্রাচীর ... ৫
৩। ভাসমান ডক্ (Floating Dock) ... ৭
৪। পাহাড় খুদিয়া মানুষের মুখ আঁকা ... ১০
৫। কলের কোদালি ... ১৩
৬। ভার তুলিবার কৌশল ... ১৬
৭। ফেরো-কংক্রীট (Ferro-Concrete) ... ২৬
৮। নদীতে বাঁধ ... ৩০
৯। খাল পথ ... ৪৪
১০। জুইডার জী (Zuider Zee) .. ৫৫
১১। বন্ধুরতা (Friction) ... ৫৭
১২। পিরামিড ... ৬৪
১৩। চলন্ত সোপান (Escalator) ... ৬৯
১৪। কলে কাপড় কাচা ... ৭০
১৫। রেল ইঞ্জিনের জন্ম ... ৭৩
১৬। কারিগরের সেরাকীর্ত্তি ... ৭৮
১৭। ভূগর্ভে রেলপথ (Tube Railway) ... ৮৩
১৮। পার্ব্বত্য রেলপথ ... ৯০
১৯। এক খিলান পুল ... ৯৩
২০। অতিকায় নোঙ্গর ... ৯৬
২১। শূন্যে দড়িপথ ... ৯৭
২২। কারিগরের কয়েকটি বৃহত্তম, দীর্ঘতম ও উচ্চতম কীর্ত্তি ১০১
২৩। কয়েকটি পরিভাষা ... ১১২

১

ভূতের উৎপাত

মানুষ ও ইতর প্রাণীতে প্রভেদ—মাত্র জ্ঞানে। ইতর প্রাণীর জ্ঞান তাহার নিত্য জীবনযাত্রায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতায় বদ্ধ, কিন্তু মানুষ তাহার অভিজ্ঞতার গণ্ডি প্রসারিত করিবার জন্য নিত্য নূতন পরীক্ষায় ব্যস্ত। জ্ঞান তাহাকে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিবার চাবিকাঠি হাতে তুলিয়া দিয়াছে। মানুষ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে প্রকৃতির অন্ধ ও অসংযত শক্তিগুলির রহস্য জানিতে পারায় ঐ শক্তিগুলি আজ তাহার বশীভূত।

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের কথা তোমরা পূর্ব্বে পড়িয়াছ। এই ভূতগুলির উৎপাতে জীবকুলের প্রাণ অস্থির। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ বন জ্বলিয়া উঠিল। ভীত ত্রস্ত জীব প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; কেহ কেহ পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, কেহ বা অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। প্রথমে মানুষও ইহার রহস্য বুঝিতে পারিত না। এইরূপ দৈবদুর্ঘটনা দেবতার রোষ মনে করিয়া সে দেবতাকে শান্ত করিবার উপায় খুঁজিত।

এখন মানুষ অগ্নির জন্ম ও উহার ধর্ম্মের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিয়াছে বলিয়া সে ইচ্ছা করিলেই আগুন জ্বালিতে পারে, ইচ্ছা করিলেই উহা নিবাইতে পারে এবং উহাকে দিয়া বহুপ্রকার কার্য্য করাইয়া লয়।

লোকে বলে বায়ুর বল। বায়ু ক্ষেপিলে আর রক্ষা নাই। তাহার উপর অন্য ভূতের সাহায্য পাইলে ত কথাই নাই। আগুন জ্বলিলেই বায়ু কেন

ছুটাছুটি করে, বায়ুর সহিত আগুনের সম্পর্কই বা কি? এই সকল তথ্য মানুষের জানা ছিল না। এখন মানুষ বায়ুর জন্ম, প্রকৃতি ও পরিণতি জানিতে পারিয়াছে। এখনও অবশ্য বায়ু ক্ষেপিলে মানুষ বিশেষ কিছুই করিতে পারে না, তবে উহার ধর্ম্ম ও অন্যান্য ভূতগুলির সহিত উহার সম্পর্ক জানিতে পারায় কোন্ ঘটনাচক্রে বায়ু ক্ষিপ্ত হইতে পারে এবং কোন্ অবস্থায় উহার সাম্য ঘটে তাহা সে পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারে ও সাবধান হয়। বায়ুর ধর্ম্ম জানিতে পারায় মানুষ সুবিধা পাইলেই উহাকে খাটাইয়া কল চালাইয়া গম পিসিয়া আটা করে, তৈলবীজ ভাঙ্গিয়া তৈল প্রস্তুত করে, পাল তুলিয়া দুস্তর সাগর পার হয়। এমন কি আকাশে উঠিযা ঘণ্টায় তিন চারিশত মাইল বেগে ছুটিয়া যায়।

ভূতগুলির শক্তি বিশাল বটে, কিন্তু অত্যন্ত অসংযত। উহাদিগের লীলার ফলে ভাঙ্গা বা গড়া একটা দৈবসংঘটন মাত্র। প্রাকৃতিক কারণের যোগাযোগে বিশাল ঝড় উঠিতে পারে, কিন্তু উহার ফলে ভাঙ্গা বা গড়া ঝড়ের ইচ্ছাকৃত নহে।

ঐরূপ ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা প্রভৃতি বহু প্রাকৃতি দুর্য্যোগে পৃথিবীর কোথাও ক্ষতি হয়, কোথাও বা লাভ হয়; কিন্তু এই লা- বা ক্ষতি প্রকৃতির ইচ্ছাকৃত নহে। অন্ধ জড় শক্তির লীলার ফলে স্বতঃই ভাঙ্গা গড়া চলে মাত্র; প্রকৃতি একটা পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাঙ্গেও না, গড়েও না।

বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক ভূতসমষ্টির লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদিগের শক্তির প্রকৃতির পরিণতি ও স্বভাবের রহস্য জানিতে পারিয়াছেন। কোন্ ভূত কোন্ ভূতের শত্রু, কোন্ ভূতের মিত্র এবং কোন্ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকে তাহা বুঝিতে পারিয়া উহাদিগকে প্রায় বশে আনিয়াছেন। অগ্নির মিত্র বায়ু, কিন্তু জল অগ্নির মহা শত্রু; অতএব ক্ষিপ্ত অগ্নিকে সাম্য করিতে হইলে বায়ুর সংস্পর্শ বন্ধ করিতে হইবে এবং জলের সহিত মিলন ঘটাইতে হইবে।

এইরূপ ভূতগুলি ধর্ম্ম ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করিয়া মানুষ উহাদিগকে বশীভূত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে।

কারিগর বৈজ্ঞানিকের এই পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ক্ষেত্র বিশেষে প্রযোগ করিয়া মানুষের কাজে লাগাইয়াছে। ফলে মানুষের শক্তি সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ (controlled); সেইজন্য ভাঙ্গা বা গড়া মানুষের ইচ্ছাকৃত।

জলের শত্রু অগ্নি। অগ্নির তাপ উহার একটি প্রকাশ। তাপের ফলে সাগরের জল মেঘে পরিণত হয়। অগ্নির সখা বায়ু উহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া পাহাড়ের গায়ে আছাড় মারে। দুই বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া জলের নাকালের একশেষ হয়। মেঘ পাহাড়ের শীতল কঠিন গায়ে ঠেকিবামাত্র জমিয়া বৃষ্টিধারায় নামিয়া পড়ে। এই বৃষ্টিধারা উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আর এক অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তি, মাধ্যাকর্ষণের বশে নিম্নভূমিতে বন্যারূপে বেগে ছুটিয়া আসে।

এই অসংযত বন্যায় জীবকুলের ক্ষতি ও লাভ দুইই হয়। প্রথম বন্যার বেগে কতক জীবকুল ভাসিয়া যাইলেও বন্যার জল নামিয়া গেলে তথায় প্রচুর শস্য জন্মিয়া বহু জীবকুলের বাঁচিবার উপায় করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃতির এইরূপ অসংযত দানে একটা খেয়ালের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য মানুষ যতদিন প্রকৃতির খেয়ালের দানের অধীন ছিল, ততদিন তাহার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। ঘটনাচক্রে অনাবৃষ্টি হইল, চাষ আবাদ কিছুই হইল না; আহার না পাইয়া জীবকুলের কতকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। খেয়ালে কোথাও অতিবৃষ্টি হইল, সেখানেও জীবের দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। দৈবাৎ কোথাও প্রয়োজন মত বৃষ্টি হইল, প্রচুর শস্য জন্মিল; ধনধান্যে ধরা পূর্ণ হইল।

মানুষ যতদিন প্রাকৃতিক ভূতগুলির রহস্য জানিতে পারে নাই, ততদিন মুখ বুজিয়া উহাদের উৎপাত সহ্য করিয়াছে এবং নিজের ভাগ্যকে কখন নিন্দা বা কখন প্রশংসা করিয়াছে। এখন সে বিজ্ঞানের চাবিকাঠি দিয়া প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়া পুরুষকারের সাহায্যে

ভাগ্যকে প্রয়োজন মত অতিক্রম করে। এক স্থানের প্রাচুর্য্য দিয়া অন্য স্থানের দৈন্য সে মিটাইতে শিখিয়াছে। বর্ষার প্রাণপূর্ণ বন্যার জল সে বাঁধিয়া রাখে অনাবৃষ্টির দৈন্য মিটাইবার জন্য। শত সহস্র খাল কাটিয়া মানুষ মরুপ্রান্তরের তৃষিত বক্ষে প্রচুর জলধারা লইয়া গিয়া আজ মরুভূমিতে সোনা ফলাইতেছে। অজন্মা প্রেত এখন আর মানুষের রক্ত শোষণ করিতে পারে না। বিজ্ঞানের গুণে বাহাদুর কারিগর আজ উহাকে কুপোয় পুরিয়া উহার মুখ আঁটিয়া দিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে।

কারিগর এখন অতি দুর্গম পথেরও অন্তরায় হরণ করিয়া পথ সুগম করিয়া দেয়। কারিগর মানুষকে পাখীর অনুকরণে পাখা দেওয়ায় আকাশ পথ আজ তাহার অতি সুপরিচিত। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বশে উচ্চ ভূমি হইতে নদী নিম্ন ভূমিতে বেগে নামিয়া আসিয়া নায়গ্রার মত দুর্দ্দান্ত জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। এইরূপ জলধারার অসংযত বিশাল বেগকে সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মানুষ ইচ্ছামত ডাইনামো (Dynamo) চালাইয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এবং শত শত মাইল দূরস্থিত জনপদ ও নগরীর সেবায় নিযুক্ত করে।

জড়শক্তি বিশাল হইলে কি হয়, ক্ষুদ্র মানুষের বুদ্ধির নিকটে বাঁধা পড়িয়াছে। বিশাল শক্তিশালিনী আকাশের অসংযতা বিজলীদেবী মানুষের ঘরে অতি বিনীতা ও বশংবদা রাত্রিদিনের দাসী মাত্র। মানুষ বুদ্ধিবলে বন্যার মত কোন হঠাৎ জাগ্রত অসংযত ভূতকে বশীভূত করিয়া যেমন নিজের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে, ঠিক সেইরূপ প্রয়োজন হইলে ক্ষেত্র বিশেষে কাষ্ঠে সঞ্চিত নিদ্রিত অগ্নির মত কোন ভূতকে জাগরিত করিয়া খাটাইয়া লইতে শিখিয়াছে।

কারিগর পঞ্চভূতের ধর্ম্ম ও স্বভাব জানিয়া উহাদিগকে বশ করিয়াছে। মানুষ একদিন ভূতগুলির অসহ্য উৎপাতে অস্থির হইয়া বেড়াইত, আজ সে একনিষ্ঠ সাধনার বলে ভূতসিদ্ধ। আজ আর বিজলীদেবী হঠাৎ বজ্রাঘাতরূপে বাড়ীর উপরে নামিয়া আসিয়া ধ্বংস আনয়ন করিতে পারে না। কারিগর

উহার ধর্ম্মানুসারে ধরাবক্ষে তাহার নামিবার সরল পথ আজ প্রতি বাড়ীতে করিয়া রাখে। মানুষ তাহাকে এমনি বশ করিয়াছে যে তাহার ইঙ্গিতে সে গাড়ী টানে, আলো দেয়, রাঁধে, পাখা করে ; এইরূপ কত শত প্রকারে যে রাত্রিদিন সে মানুষের সেবা করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

২

চীনের প্রাচীর

মানুষের হাতের কাজ প্রকৃতির হাতের কাজের তুলনায় অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। হিমালয়ের তুলনায় পিরামিড বা আমাজন নদের তুলনায় সুয়েজ খাল বা পানামা খাল কিছুই নয়। তবুও মানুষের অন্ততঃ একটা কীর্ত্তি প্রকৃতিদেবীর কীর্ত্তির কাছে দাঁড়াইতে পারে।

চীনের বিশাল প্রাচীর গড়িয়া কারিগর ধৈর্য্যের ও শক্তির বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে। খ্রীষ্ট জন্মিবারও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে চীন সম্রাট্ সীঃ হোয়াংতি উত্তরাঞ্চল হইতে আগত অসংখ্য তাতার বাহিনীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই সুদীর্ঘ প্রাচীরটি গঠন করেন।

একালের ফ্রান্সের বিশাল ও শক্তিশালী ম্যাজিনো লাইন (Maginot Line) যেমন ফ্রান্সকে শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে পারিল না, সেইরূপ উক্ত সুদীর্ঘ দৃঢ় প্রাচীর শস্যশ্যামল চীনকে উত্তরাঞ্চলের অনুর্ব্বর দেশের বুভুক্ষু শত্রুবাহিনীর কবল হইতে বাঁচাইতে পারে নাই।

এই প্রাচীরটী দৈর্ঘ্যে ১৪০০ মাইল, এবং প্রস্থে পাদদেশে ২৫ ফুট ও শীর্ষে ১৫ ফুট ; ইহা উচ্চে ১৫ হইতে ৩০ ফুট। প্রতি ২০০ গজ অন্তর প্রাচীরের উপর ৪০।৪৫ ফুট উচ্চ একটী করিয়া ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। এই দুর্গে থাকিয়া সৈন্যগণ দিনরাত্রি পাহারা দিত।

বর্ত্তমানে এই প্রাচীরের সার্থকতা না থাকায় ইহার ১৫ ফুট চওড়া মাথায় একটা মোটর পথের ব্যবস্থা হইতেছে। কালের প্রভাবে ও সতর্ক দৃষ্টির অভাবে

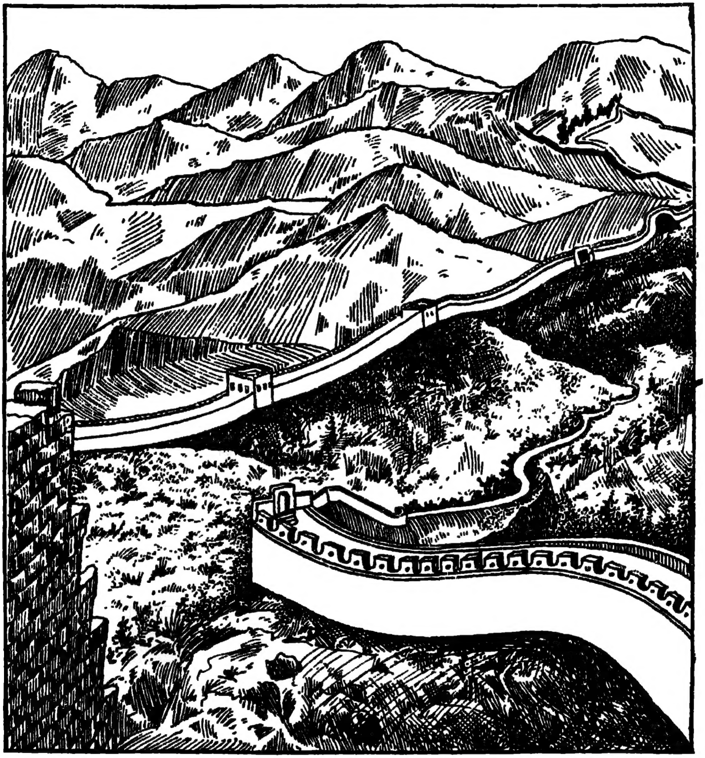

চীনের প্রাচীর

আজকাল ইহার বহুস্থান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ঐ সকল স্থান মেরামত করিয়া লইলে অতি সহজেই ও অতি অল্প ব্যয়ে ১৪০০ মাইল দীর্ঘ পাহাড়ের মাথায় এক অদ্ভুত মোটর চলিবার পথ প্রস্তুত হইবে। কারিগরের বাহাদুরির এই একমাত্র পরিচয় প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে কিছু টেক্কা দিতে পারে।

৩

ভাসমান ডক্ (Floating dock)

জাহাজ কিছুদিন সমুদ্রপথে যাতাযাত করিলেই উহার তলদেশে নানা জলজ জীব ও উদ্ভিদ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহাকে ভারী করিয়া তুলে, ফলে উহার গতিবেগ কমিয়া যায়। তাহার উপর নোনা জলে কিছুদিন জাহাজ থাকিলে জাহাজের লোহার পাতগুলিও মরিচা ধরিয়া ক্ষয় হইতে থাকে। এই সকল কারণে মাঝে মাঝে জাহাজের খোলের বহিরাংশ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া রং করা প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্বের ড্রাই-ডক্ (Dry-dock)

পূর্ব্বে জাহাজকে কোন বন্দরে লইয়া গিয়া এক মুখ খোলা বিশাল একটি চৌবাচ্ছায় পুরিয়া দেওয়া হইত। সমুদ্র বা নদীতীরে মাটি কাটিয়া তলদেশ ও চারিপাশ কংক্রীট্ করিয়া এই চৌবাচ্ছাটি নির্ম্মাণ করা হয়। চৌবাচ্ছাটি ও জলের মাঝে দৃঢ় কপাটের ব্যবস্থা থাকে। কপাট বন্ধ করিয়া দিলে বাহিরের জল চৌবাচ্ছায় প্রবেশ করিতে পারে না। উহা এত বড় যে জাহাজটি সহজেই উহাতে ধরিতে পারে। তাহার পর চৌবাচ্ছার প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিয়া উহার জল শক্তিশালী পাম্প সাহায্যে ছেঁচিয়া ফেলা হয়। জল ছেঁচিতে ছেঁচিতে জাহাজটি ক্রমশঃ নামিয়া গিয়া চৌবাচ্ছার তলদেশে গিয়া দাঁড়ায়। তখন চৌবাচ্ছার জল বাহির করিয়া ফেলায় উহা শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবে তখন জাহাজটি ডাঙ্গায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় জাহাজটিকে খাড়া রাখিবার ব্যবস্থা থাকে।

এইরূপ বিশাল চৌবাচ্ছাকে (Dry-dock) ড্রাই-ডক্ বলে। জাহাজ এইরূপ ড্রাই-ডকে প্রবেশ করিবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে উহাকে জলশূন্য করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

তাহার পর কারিগরেরা দলে দলে লাগিয়া পড়ে এবং শীঘ্রই জাহাজটিকে আগাগোড়া চাঁচিয়া রং করিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলে।

বর্ত্তমানের ড্রাই-ডক্

কিন্তু বর্ত্তমানের যাত্রীবাহী জাহাজগুলি বিশালকায় হওয়ায় দেখা গেল যে উহার উপযুক্ত ড্রাই-ডক্ নির্ম্মাণ করা অতিশয় ব্যয়সাধ্য। তাহার উপর সকল বন্দরে উহা প্রস্তুত করিবার মত শক্ত ভিত্তি পাওয়া যায় না। এইরূপ ড্রাই-ডকের একটী মস্ত অসুবিধা যে উহা যেস্থানে প্রয়োজন সেইস্থানেই নির্ম্মাণ করিতে হয়; জাহাজের মত অন্য স্থানে সুবিধা মত প্রস্তুত করিয়া আনা চলে না এবং একবার প্রস্তুত হইয়া গেলে, প্রয়োজন হইলে অন্য কোথাও টানিয়া লইয়া যাওয়া যায় না।

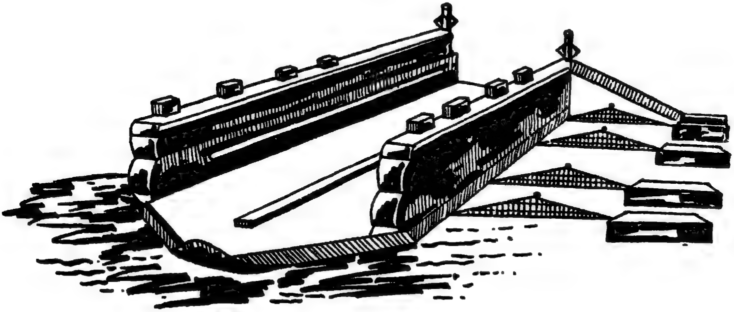

ড্রাই-ডক—জাহাজ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে

এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য কারিগর অন্য এক উপায় করিয়াছে। এখন সে কংক্রীটের ড্রাই-ডক্ নির্ম্মাণ না করিয়া কাঠ লোহার পাতে মুড়িয়া একটি বিশাল জাহাজের খোল গড়ে। ইহার তলদেশের আকার ইংরাজি U অক্ষরের মত দেখিতে হয়। ইহার উপরের অংশের সম্মুখ ও পিছনের দিক কাটা।

এই কাষ্ঠনির্ম্মিত ড্রাই-ডকের তলদেশে কতকগুলি লৌহনির্ম্মিত মুখ আঁটা চৌবাচ্ছা থাকে। এইগুলি প্রয়োজন মত জলপূর্ণ করিলে উহার তলদেশ জাহাজের তলদেশেরও তলায় গিয়া দাঁড়ায়। তখন জাহাজটাকে টানিয়া ইহার মধ্যে আনা হয়। তাহার পর চৌবাচ্ছাগুলির সমস্ত জল পাম্প করিয়া ছেঁচিয়া ফেলা হয়। জল যত ছেঁচা হইতে থাকে, ততই ড্রাই-ডক্‌টি জাহাজটিকে গর্ভে লইয়া জলের উপর উঠিতে থাকে। শেষে জলপূর্ণ খোলটি গর্ভে জাহাজটি লইয়া সমুদ্র-বক্ষের উপরে উঠিলে, খোলের জলও ছেঁচিয়া ফেলা হয়। তখন কাষ্ঠের শুষ্ক খোলে জাহাজ আসিয়া দাঁড়ায় এবং কারিগরেরা উহাকে ইচ্ছামত আগাগোড়া চাঁচিয়া রং করিয়া একেবারে নূতন করিয়া দেয়।

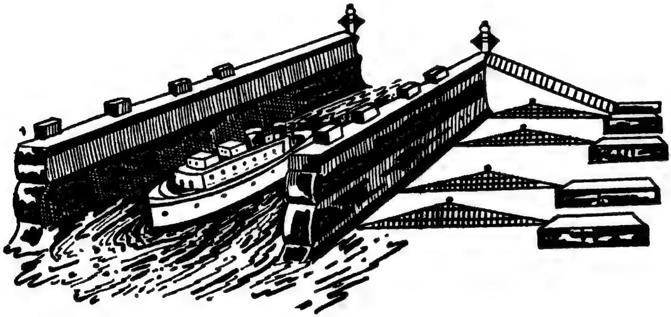

ড্রাই-ডক—জাহাজ-শুদ্ধ খোলটী সমুদ্রজলের উপরে উঠিয়াছে

ইংলণ্ডের সাদাম্‌টন বন্দরে এইরূপ একটি বিশাল ড্রাই-ডক্ আছে। উহার তলদেশস্থ চৌবাচ্ছাগুলি জলশূন্য করিলে ৬০,০০০ টনের জাহাজও লইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে পারে। ৯১৫ ফুট দীর্ঘ, ১০০ ফুট প্রস্থ ও ৫৮ ফুট গভীর ৫৬,৬২১ টনের *Majestic* জাহাজখানি ইহাতে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে।

কিছুদিন পূর্ব্বে টাইন্ (Tyne) বন্দরের শিল্পশালায় একটী ৫০,০০০ টনের জাহাজ গর্ভে লইয়া জলের উপরে উঠিয়া ভাসিতে পারে এইরূপ একটী

ড্রাই-ডক্ নির্ম্মাণ করিয়া সিঙ্গাপুরে টানিয়া লইয়া পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে আর একটী বিশাল ড্রাই-ডক্ সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ১৩,৫০০ মাইল টানিয়া New Zealandএ পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪

পাহাড় খুদিয়া মানুষের মুখ আঁকা

প্রকৃতির কার্য্য

প্রকৃতিদেবী তাঁহার দুই অনুচর জল ও বায়ুর সাহায্যে দিবারাত্র উঁচু পাহাড়কে ভাঙ্গিয়া মনের মত নানা আকারে গড়িতেছেন। বায়ু ও জলের সহযোগে মৃত্তিকায় উদ্ভিদ জন্মিয়া ভাঙ্গা-গড়ার কাজে প্রকৃতিদেবীকে আরও খানিক সাহায্য করে। ঝড়ের মুখে বালি ও কাঁকর উড়িয়া আসিয়া মানুষের হাতের ডিনামাইট ও হাতুড়ীর মত কাজ করে। শীত ঋতুতে পাথরের ফাটলে জল জমিয়া বরফ হইয়া ফাঁপিয়া উঠে, উহাও অমিত বিক্রমে বড় বড় পাথরের টুক্‌রা ভাঙ্গিয়া ফেলে; এইরূপে প্রকৃতিদেবীর খোদাই কার্য্য অলক্ষে অবিরামে চলিয়াছে।

ভারতে অজন্তা গুহা

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষও প্রকৃতিদেবীর অনুকরণে বড় বড় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে মানুষ যখন বর্ত্তমান-যুগের শক্তিশালী নানা যন্ত্র কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তখন একটি পাহাড়ের গুহাগাত্র খুদিয়া ভারতের অজন্তা গুহায় যে অত্যদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে পৃথিবীতে তাহার তুলনা মেলা ভার। প্রকৃতিকেও এ বিষয়ে মানুষ টেক্কা দিয়াছে। প্রকৃতি অন্ধ, তাহার অনুচরবর্গ বিশাল শক্তিশালী বটে,

কিন্তু উহাদিগের শক্তি অসংযত। ফলে, ভাঙ্গিতে গিয়া যেটুকু মাত্র গড়িয়া উঠে ; কিছু গড়ার উদ্দেশ্যে উহারা ভাঙ্গে না। মানুষ কিন্তু বুদ্ধিমান ও সচেতন, তাহার শক্তি সংযত ; সে গড়ার উদ্দেশ্য লইয়াই ভাঙ্গে।

মিশরের স্ফিনক্স (Sphinx)

প্রাচীনকালের এইরূপ মানুষের কীর্ত্তি স্বরূপ মিশরের দৈত্যমূর্ত্তির (Sphinx) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মূর্ত্তিটী একটা ক্ষুদ্র পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত।

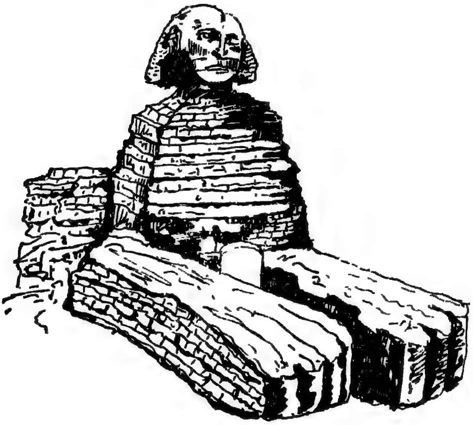

স্ফিনক্স

ইহার মুখটি মানুষের, কিন্তু দেহটি সিংহের। উচ্চতায় ভূমি হইতে মাথা পর্য্যন্ত ৬৬ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে সিংহের সম্মুখের পদদ্বয় হইতে লাঙ্গুলের শেষ পর্য্যন্ত দুইশত ফুটেরও অধিক। ইহার মুখটি দৈর্ঘ্যে ৩৩ ফুট ও প্রস্থে ৭॥ ফুট, ইহার নাক ৫॥ ও কান দুটী ৫ ফুট দীর্ঘ। এতদিন ইহার অধিকাংশ বালির স্তূপে পোঁতা ছিল। এই বালির পাহাড় সরাইয়া সম্পূর্ণ দৈত্যমূর্ত্তিটি লোকচক্ষুর গোচর করিতে ৮০০ শত মজুরকে ছয় মাস ধরিয়া খাটিতে হইয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পিত কীর্ত্তি

দক্ষিণ ডাকোটায় (Dakota) ৮০০শত ফুট উচ্চ ও ৩,০০০ ফুট দীর্ঘ একটি ছোট পাহাড় (Mount Rushmore) আছে। ইহার একটি অংশ একেবারে খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। এই খাড়া অংশটির ক্ষেত্রফল প্রায় ২০০ বিঘা। এই পাহাড়টি চুণে পাথর বা বেলে পাথরের নয়, অতি কঠিন গ্রানাইট পাথরের। এই পাহাড়ের খাড়া পাশটিকে কাটিয়া ভাস্কর **Gut zon Borglum** আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাত চারিজন রাষ্ট্রপতির মুখ খুদিতেছেন।

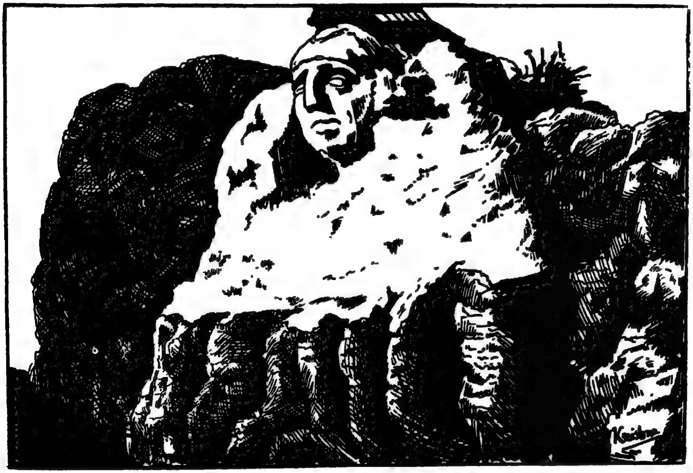

রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটনের মুখ

ওয়াশিংটন, জ্যাফারশন, লিঙ্কন ও রুজভেল্ট—এই চারিজন রাষ্ট্রপতির মুখের পাশে রাষ্ট্রপতি কুলিজ (Coolidge) কর্ত্তৃক ৫০০ শত শব্দে লিখিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইতিবৃত্ত খোদাই করা হইবে। ইহার প্রতি অক্ষরটি তিন ফুট উচ্চ হইবে এবং তিন মাইল দূর হইতে স্পষ্ট পড়িতে পারা যাইবে।

কয়েক বৎসর ধরিয়া খাটিলে মানুষের এই অক্ষয়কীর্ত্তিকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারা যাইবে। বায়ুচালিত ছিদ্র করিবার যন্ত্রে ফুটা করিয়া ডিনামাইট দিয়া ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা উড়াইয়া দিয়া মূর্ত্তিগুলি খোদাই হইতেছে। বর্ত্তমানের যন্ত্রযুগের অত্যন্ত উন্নত যন্ত্রের সহিত পুরাকালের সামান্য যন্ত্রের বিষয় তুলনা করিলে তখনকার দিনে মানুষকে দৈত্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে কতদিন কতই না পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল!

৫

কলের কোদালি

আজকাল মানুষকে যেরূপ বড় বড় কাজ করিতে হয়, তাহা তাহার ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়া করা সম্ভব নহে; সেইজন্য সে নানারূপ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে।

পানামা খাল খনন করিতে যতখানি মাটি ও পাথর কাটিতে হইয়াছিল তাহা সনাতন গাইতি ও কোদালি দিয়া কাটিলে কোন দিনই ঐ খাল কাটা সম্ভবপর হইত না। আজকাল এইরূপ খাল কাটিবার জন্য বাষ্পচালিত কলের কোদালি ব্যবহার করা হয়।

এই কোদালি এক কোপে একশত টন (প্রায় ২,৭০০ মণ) মাটি, পাথরের টুকরা, কাটা কয়লা ইত্যাদি চাঁচিয়া ৮৫ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিতে পারে। যে কোদালিতে একখানি মোটরগাড়ী সহজেই স্থান পায়, তাহার বিশাল রূপ সহজেই অনুমেয়।

জাহাজে কয়লা বোঝাই করিবার সময় আমেরিকায় আজকাল এইরূপ কোদালি ব্যবহার করা হয়। এইরূপ কোদালি চালাইতে দুইটী মাত্র লোকের

প্রয়োজন হয়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে এইরূপ শত শত কৌশল আয়ত্ত করিলে কি হইবে, ইহাতে কিন্তু শত শত লোক বেকার হইয়া পড়িতেছে।

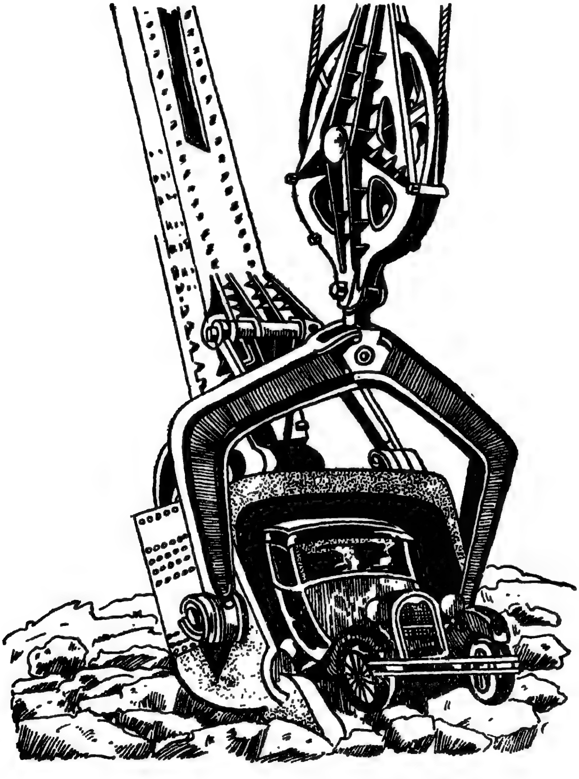

কলের কোদালিতে একখানি মোটর গাড়ী

জার্ম্মাণীতে মাটির নীচে ইলেক্‌ট্রিকের তার লইয়া যাইবার জন্য খানা কাটিতে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী কলের কোদালি ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা ঘণ্টায়

৩৷৷০ ফুট গভীর ও ৩০০ ফুট দীর্ঘ খানা কাটিতে পারে। এই কোদালিটিকে ট্রাক্টারের (Tractor) সাহায্যে টানিয়া আগুপিছু চালাইতে পারা যায়।

অপরিসর ও অগভীর জলপথ খুঁড়িবার জন্য যে ড্রেজার (কলের কোদালি) ব্যবহৃত হয়, উহা একসারি, পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, ইস্পাতের বালতির একটি মালার মত দেখিতে। বালতিগুলির কানা কোদালির মত ধারাল। এই মাটিকাটা বালতির মালাটির প্রতি বালতিটি ধীরে ধীরে জলের নীচে গিয়া জাহাজের তলদেশের মাটি কাটিযা লইয়া উপরে উঠে এবং কাটা মাটি, পাঁক, কাঁকর ইত্যাদি তুলিয়া আনিয়া মোটা নলের মুখে জলপথের দুই তীরে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেয়।

এইরূপে জাহাজটি জলের উপরে থাকিয়া ধারাল বালতির কানা (Brim) দিয়া জলপথের গভদেশের মাটি চাঁটিয়া উহাকে গভীর ও বড় জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত করে।

সম্প্রতি ইয়োরোপের এক বড় সহরের জল নিকাশের একটী বৃহৎ পয়ঃনালী খনন করিবার জন্য একটি কলের কোদালি ব্যবহার করা হইয়াছে। উহা একা এক হাজার শ্রমিকের কাজ করিতে পারে। ঐ দেশে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অত্যধিক, ফলে মজুরি দিয়া কোন বড় কাজ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য সেখানে যন্ত্র দিয়া কাজ করিবার চেষ্টা এত অধিক।

আর এক কথা। পানামা খালের মত খুব বড় কাজ মানুষের হাতে কাটিয়া কোন দিন শেষ হইত না। পানামা খাল কাটিতে ৪০ কোটী টন মাটি, পাথর, কাঁকর কাটিতে হইয়াছিল ও দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। পানামা খালপথে কুলেব্রা নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় পড়ে। উহাকে বিস্ফোরক পদার্থ দিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। এই স্থান হইতে দিনে ১০০,০০০টন পাথরের টুক্‌রা সরাইয়া ফেলিবার জন্য মানুষের ক্ষুদ্র হাতের ছোট কোদালি দিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিয়া ও মাথায় বহিয়া এই বিশাল পাথরের টুক্‌রার স্তূপ কোনদিন কি সরাইতে পারা যাইত, না কাটিতে পারা যাইত? সেইজন্য এই খাল-পথ কাটিতে

৯৮টি কলের কোদালি ব্যবহার করা হইয়াছিল। এইরূপ কোদালির এক কোপে ৫।১০ টন মাটি, কাঁকর উঠে। এই যন্ত্রদানবগুলির সাহায্যে মানুষ পাহাড় কাটিয়া, চাঁচিয়া, গাড়ী বোঝাই করিয়া খালের পথ করিতে পারিয়াছে।

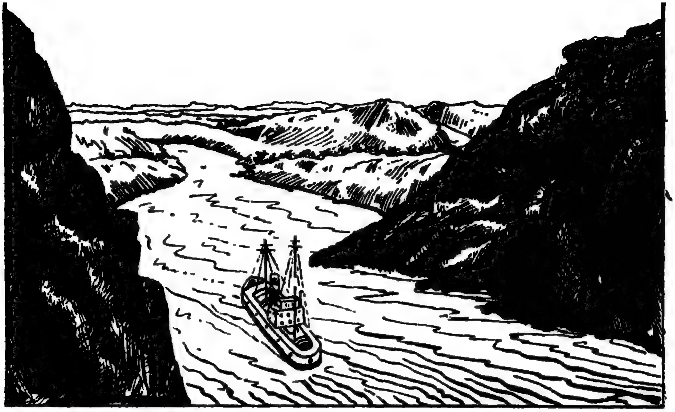

দ্বিখণ্ডিত কুলেব্রা দিয়া পানামা খাল-পথ

৬

ভার তুলিবার কৌশল

(১) দণ্ড (Lever)

পরিশ্রম লাঘব করাই যন্ত্রের উদ্দেশ্য। বহু পশু দৈহিক বলে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, মানুষ তাহার হাত দুইটি এমন কৌশলে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, যে তাহারা মানুষকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

দণ্ডই মানুষের প্রথম যন্ত্র

মনে হয় মানুষ দণ্ডকেই প্রথমে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। একগাছি লাঠি থাকিলে বলশালী শত্রুকেও টলাইতে পারা যায়; আবার ভারী বস্তুর নীচে চাড় দিয়া উহাকে সহজে নড়াইতে পারা যায়। ভার তুলিবার সময় মানুষ দণ্ডকে তিন প্রকারে ব্যবহার করিতে পারে।

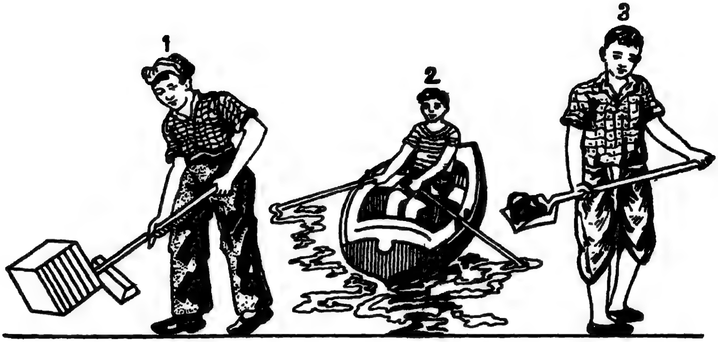

দণ্ড ব্যবহারের তিন রীতির প্রয়োগ

দণ্ড ব্যবহারের প্রথম রীতি

কোন ভারী বস্তুকে নড়াইতে হইলে একটা দণ্ডের একপ্রান্ত বস্তুটির নীচে দিতে হয়, তাহার পর দণ্ডটির মধ্যদেশ একটা পাথরের টুকরার (ঠেস্) উপর রাখিয়া অন্য প্রান্তে চাপ দিতে হয়। পাথরের টুকরাটি যদি দণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে থাকে, তাহা হইলে বস্তুটিকে তুলিতে হইলে বস্তুটির ওজনের সমান চাপ দিতে হইবে। তুলাদণ্ডে এই রীতিরই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঠেস্ দিবার পাথরটি যদি দণ্ডের মধ্যবিন্দু হইতে সরাইয়া বস্তুটির নিকটে বসান হয়, তাহা হইলে বস্তুটির ওজন অপেক্ষা অল্প চাপ দিতে হইবে। ঠেস্‌টি যদি দণ্ডের মধ্যবিন্দু হইতে সরাইয়া হাতের নিকটে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে বস্তুটির

ওজন অপেক্ষা বেশী চাপ দিতে হইবে। সাঁড়াশী, কাঁচি, চাবিকাঠি ইত্যাদি বহু নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য এই দণ্ড ব্যবহারের এই রীতিরই প্রয়োগ মাত্র।

ধর, দণ্ডটি চার হাত বা ছয় ফুট লম্বা। ইহার মধ্যবিন্দুতে ঠেস্‌টি (Falcrum) দিলে তিন মণ তুলিতে তিন মণ চাপের প্রয়োজন হইবে। ঠেস্‌টি ভার হইতে একহাত দূরে দেওয়া হইল, তখন ভারটি তুলিতে মাত্র একমণ চাপের প্রয়োজন হইবে। আবার ঠেস্‌টি নড়াইয়া ভার হইতে তিন হাত দূরে চাপ দিবার প্রান্তের নিকটে রাখা হইল, তখন ঐ তিন মণ তুলিতে ৯ মণ চাপের প্রয়োজন হইবে।

ভার ও চাপের সম্পর্ক

একটি ভার তুলিতে কতখানি চাপের প্রয়োজন হইবে তাহা জানিবার একটি সহজ সূত্র আছে।

ভার × ঠেস্ হইতে ভারটির ব্যবধান = চাপ × ঠেস্ হইতে চাপটির ব্যবধান। ঠেস্‌টি ভারের যত নিকটে থাকিবে, ভারটি নড়াইতে বা তুলিতে তত কম চাপের প্রয়োজন হইবে। দণ্ডটি বড় হইলে একটি বালকেও ভারী ভারী মাল নড়াইতে পারে।

দণ্ড ব্যবহারের দ্বিতীয় রীতি

ঠেস্‌টি থাকে একপ্রান্তে, ভার মাঝে ও চাপ দেওয়া বা শক্তি প্রয়োগ করা হয় অন্য প্রান্তে। কলিকাতায় ধাঙ্গড়েরা যে ছোট ছোট গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যায়, উহা দণ্ড ব্যবহারের এই রীতিরই একপ্রকার প্রয়োগ মাত্র। গাড়ীটি একটি দণ্ড স্বরূপ; সম্মুখের ক্ষুদ্র চাকাটি ঠেস্, মালশুদ্ধ গাড়ীর ভার গাড়ীর মাঝামাঝি কোন স্থানে নীচের দিকে চাপ দেয় এবং গাড়ীর হাতলে, আর এক প্রান্তে, ধাঙ্গড় উপরদিকে শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহাকে তুলে; তাহার পর ঐটিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। নৌকার দাঁড় দণ্ড ব্যবহারের এই রীতিরই আর একটি প্রয়োগ। এই ক্ষেত্রে ঠেস্‌টি জল, দাঁড়টির একপ্রান্ত উহাতে ডুবিয়া আছে; ভারটি,

আরোহীশুদ্ধ নৌকাটি, দাঁড়ের মাঝে কোন স্থানে চাপ দিতেছে এবং দাঁড়ের আর একপ্রান্তে মাঝি দাঁড় টানিয়া শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। জাঁতি এই রীতিরই আর একটি প্রয়োগ।

এই স্থলে ঠেস্ হইতে চাপের ব্যবধান, সকল সময়েই ঠেস্ হইতে ভারের ব্যবধান হইতে অধিক ; সেইজন্য নৌকার ভার অপেক্ষা অল্প চাপ দিলেই নৌকা চলে।

দণ্ড ব্যবহারের তৃতীয় রীতি

এক্ষেত্রে ঠেস্‌টী একপ্রান্তে, ভারটী থাকে অন্য প্রান্তে ও চাপ দেওয়া হয় দণ্ডের মাঝামাঝি কোন স্থানে। শভেল দিয়া কয়লা, বালি ইত্যাদি তোলা দণ্ড ব্যবহারের এই রীতির একটি প্রয়োগ মাত্র। আমাদের হাতের ব্যবহার এই নিয়মেরই আর একটী উদাহরণ।

(২) ঢালু পথ (Inclined plane)

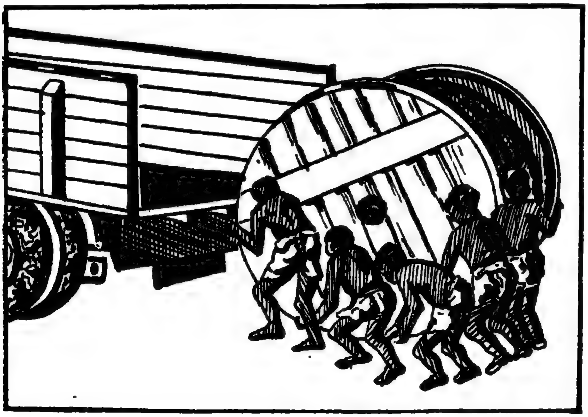

যে নিয়মে দণ্ডের সাহায্যে কোন ভারী জিনিস তোলা নির্ভর করে, উহাকে নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করা চলে :

দীর্ঘ পথে অল্প শক্তি প্রয়োগ করিলে স্বল্প পথে প্রযুক্ত অধিক শক্তির মত ফল পাওয়া যায়। এই নিয়মই ঢালুপথ নির্ম্মাণে প্রয়োগ করা হয়।

কোন ভারী জিনিস অন্যস্থানে লইয়া যাইতে হইলে গাড়ীতে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু যে জিনিস গাড়ীতে তুলিয়া দিতে দশজনের প্রয়োজন হয়, ঢালুপথের সাহায্যে উহাই মাত্র দুইজনে ঠেলিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে পারে।

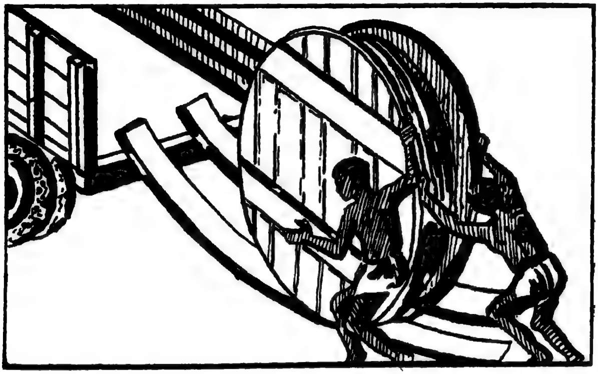

প্রাচীনকালে মিশরদেশে পিরামিড্ নির্ম্মাণকালে এত কল-কৌশলের ব্যবস্থা ছিল না। উহারা হাজার মণ অপেক্ষাও ভারী পাথরগুলি ঢালুপথে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অল্প আয়াসেই পাঁচশত ফুট উচ্চে তুলিয়াছিল।

উচ্চ পার্ব্বত্যদেশে সোজাসুজি উঠিতে বা নামিতে হইলে প্রাণ বাহির হইয়া যাইত; সেইজন্য ঐরূপ দেশে ঢালুপথে মানুষ ও গবাদি পশু যাতায়াত করে। পাহাড়ে এই ক্রমশঃ ঢালু পথের নাম পাকৃডাণ্ডি। সিঁড়ি এই কৌশলেরই আর একটি প্রয়োগ মাত্র।

(৩) দড়ি ও কপিকল (Puley)

মানুষ দেখিল ঢালু পথে উচ্চে ভারী বস্তু তোলা চলে বটে, কিন্তু ঢালু পথ নির্ম্মাণ করা বহুক্ষেত্রে এত ব্যয়বহুল যে সকল সময় উহা করা সম্ভবপর

হয় না। সেইজন্ত সে অন্ত উপায় খুঁজিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে সে চাকা উদ্ভাবন করিয়া বন্ধুর পথ মালবহনের পক্ষে অনেকটা সুগম করিয়াছে। কপিকল চাকারই একটা নূতন প্রয়োগ মাত্র। উচ্চে মাল তুলিতে হইলে মালে দড়ি বাঁধিয়া উপর হইতে টানিয়া তুলিতে হয়। সাধারণতঃ কূপ হইতে জল এইরূপেই তোলা হয়। কিন্তু এই উপায়ে অতিশয় ভারী মাল তোলা সম্ভব নহে। উপরে দাঁড়াইয়া ভারী মাল টানিয়া তুলিবার সময় তেমন জোর পাওয়া যায় না। মালে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি উপরে কোন ঠেসে ঝুলাইয়া নীচে দাঁড়াইয়া টানা যায়, তাহা হইলে টানিবারও সুবিধা, এবং নিজের দেহের ভারেরও সাহায্য পাওয়া যায়।

ঠেসে দড়ি গলাইয়া টানিবার সময় দেখা গেল যে, ঠেসটি যতই মসৃণ হউক না কেন, মালের ভারে দড়িটি তেমন ভাল চলে না। যদি উহা কোন ছোট চাকার খাঁজে (Groove) ফেলিয়া টানা যায়, তাহা হইলে নীচে হইতে দড়ির টানে চাকাটি উহার অক্ষদণ্ডের উপর ঘুরিতে থাকিবে। অক্ষদণ্ডটি ঠেসের কাজ করায় এবং চাকাটি ঘুরিতে পাওয়ায় অল্প আয়াসেই ভারী মালটিকে টানিয়া তুলিতে পারা যাইবে। মালের ভারে দড়িটি ঠেসের গায়ে আটকাইয়া ধরিবে না। ইহাই হইল কপিকলের মোটামুটি কৌশল।

১ম চিত্র

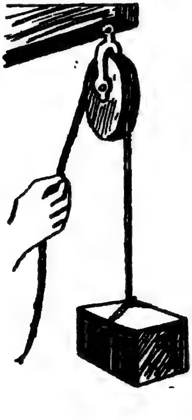

ইহার দ্বারা একগুণ শক্তি প্রয়োগে একগুণ কাজ পাওয়া যায়।

আজকাল নানাপ্রকার উন্নত সংস্করণ কপিকলের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি কপিকলের ছবি দেওয়া গেল। একগুণ শক্তি প্রয়োগে বহুগুণ কাজ করাই হইল যন্ত্রের উদ্দেশ্য।

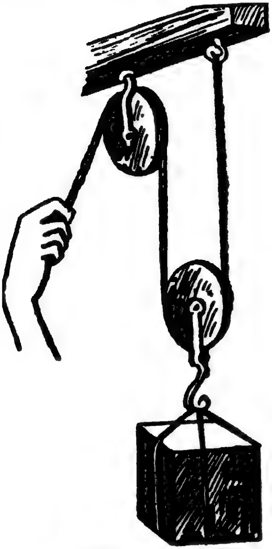

২য় চিত্র

ইহার ব্যবহারে তত লাভ নাই। ইহা দ্বারা একগুণ শক্তি প্রয়োগে দ্বিগুণ কাজ পাওয়া যায়।

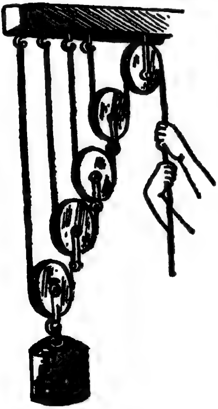

৩য় চিত্র

এইরূপ পুলির ব্যবহার সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

ইহার সাহায্যে একগুণ শক্তি প্রয়োগে ১৬ গুণ কাজ পাওয়া যায়।

৪র্থ চিত্র

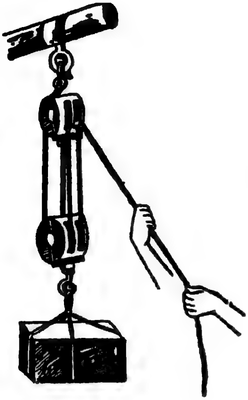

ইহার দ্বারা একগুণ শক্তি প্রয়োগে চারিগুণ কাজ পাওয়া যায়। এইরূপ পুলিং সাধারণতঃ সকল স্থলে ব্যবহার হয়।

(৪) **জ্যাক্** (**Jack**)

দণ্ডসাহায্যে ভার তুলিবার আর একপ্রকার কৌশল জ্যাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারী মাল সামান্য উচ্চে তুলিয়া ধরিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

পূর্ব্বে যখন কেবলমাত্র মানুষের ঠেলাগাড়ী বা গবাদি পশুবাহিত গাড়ীতে করিয়া অল্প মাল বহন করা হইত, তখন মালের ভারে কাঁচা রাস্তায় গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িলে মানুষ কাঁধের জোরে গাড়ী তুলিয়া ধরিয়া এক ঠেক্‌নোর উপর গাড়ীর অক্ষদণ্ডটি রাখিয়া উহা মেরামত করিত।

এখন রাস্তা পাকা, এবং মোটর লরীতে শতাধিক মণ মাল বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এইরূপ অবস্থায় চাকা ফাটিয়া গেলে, উহা খুলিবার জন্য গাড়িটীকে কাঁধে করিয়া তুলিয়া ধরা একেবারে অসম্ভব। এই সকল কাজের জন্য মানুষ জ্যাক্ উদ্ভাবন করিয়াছে। মোটর গাড়ীর ব্যবহার বৃদ্ধির সহিত জ্যাকের ব্যবহার বাড়িয়াছে। মোটর গাড়ীর চাকা খুলিয়া লইবার জন্য জ্যাক্ ব্যবহার না করিলে নয়।

মানুষ অল্পক্ষণের জন্য অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভারী গাড়ী সামান্য তুলিয়া ধরিতে পারে ; কিন্তু উহা বেশীক্ষণের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে না। এইরূপে যতটুকু সে তুলিতে পারিল, উহাই ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা জ্যাকে করা হইয়াছে। দড়ি ও ঠেক্‌নোর মধ্যে ইস্ক্রুপের প্যাঁচের ব্যবস্থা করায় মানুষের প্রতি দমে যতটুকু উঠে ততটুকুই তুলিয়া ধরিয়া রাখা চলে। এইরূপে মানুষ ক্রমে ক্রমে অতি অল্পক্ষণের জন্য তাহার যথাশক্তি বল প্রয়োগ করিয়া মাল তুলিয়া ঠেক্‌নোর প্যাঁচে প্যাচে ভার ধরিয়া রাখে।

দণ্ডের সাহায্যে অল্প আয়াসে ভারি বস্তু তোলা যায় ; কিন্তু উহাকে তুলিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য শক্তি প্রয়োগে ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। জ্যাকের ঠেক্‌নোটিকে ইস্ক্রুপ খোলার মত প্যাঁচে প্যাচে ঘুরাইয়া তুলিবার বন্দোবস্ত করায় উহা দিয়া কোন ভারি বস্তু কোনরূপে তুলিয়া উহাকে ধরিয়া রাখিতে হয় না। ফলে ক্ষেপে ক্ষেপে মানুষ অনেকক্ষণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া একাই বহু লোকের কাজ করিতে পারে।

সাধারণ জ্যাকের হাতল ঘুরাইয়া প্যাচে প্যাচে ঠেকনোটা তুলিয়া ভারী জিনিষটি তোলা হয়। নিম্নলিখিত চিত্রের আদর্শানুযায়ী জ্যাক্ সাহায্যে খুব ভারী জিনিষ তুলিতে পারা যায়।

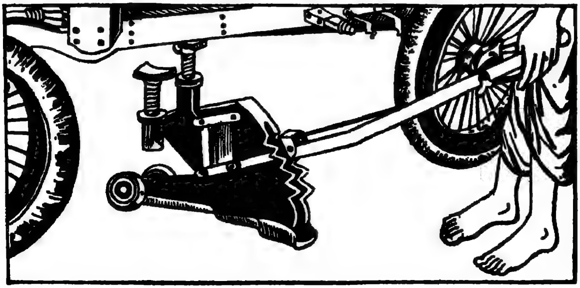

আজকাল হাজার হাজার মণ ভারি রেলের ইঞ্জিন লাইন হইতে নামিয়া পড়িলে অনেক ক্ষেত্রে জ্যাকের সাহায্যেই তুলিয়া পুনরায় লাইনের উপর রাখা হয়। এই সকল জ্যাকের ঠেক্‌নোকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাইড্রলিক্ শক্তির ব্যবহার করিতে হয়।

(৫) ক্রেণ (Crane)

আজকাল যন্ত্রযুগ। যন্ত্র সাহায্যে মানুষ বড় বড় জিনিস গড়িতে পারে। তাহার উপর যানবাহনের সুবিধা হওয়ায় মানুষ স্থায়ী কারখানায় বড় বড় জিনিষ গড়িয়া বহুদূরে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠায়। ইংলণ্ডের কারখানায় শত টন ভারি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিয়া দেশ দেশান্তরে পাঠান হয়। নদীতে পুল বাঁধা হইবে, নদীগর্ভে থামগুলি গাঁথিয়া লইবার পর কোন দূর কারখানায় গড়া লোহার কাঠামর অংশগুলি জাহাজে করিয়া অকুস্থলে আনিয়া ক্রেণ সাহায্যে তুলিয়া ধরিয়া একটীর উপর আর একটি আঁটিয়া দেওয়া হয়। যেস্থলে এইরূপ বিশাল শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন, সেইস্থানে ক্রেণ ব্যবহার করিতে হয়।

আজকাল জাহাজ হইতে তাড়াতাড়ি মাল নামাইবার জন্য বা জাহাজ মালে পূর্ণ করিবার জন্য ছোট ক্রেণ ব্যবহার করা হয়। ক্রেণেও কপিকল ও দড়ির ব্যবহার হয়, এইমাত্র প্রভেদ যে দড়িটি শক্তিশালী করিবার জন্য লোহার তারের দড়ি ব্যবহার হয় এবং খুব জোরে টান দিবার জন্য বাষ্পীয় শক্তি বা বিদ্যুৎ শক্তি দিয়া টানা হয়। ক্রেণ বাষ্পীয় বা বিদ্যুৎ শক্তি বলে কাজ করে বলিয়া উহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে নিজ শক্তি বলেই প্রয়োজন মত রেল পথের উপর সরিয়া সরিয়া কাজ করিতে পারে।

আজ বড় বড় কারখানায়, বন্দরে, রেলে ইত্যাদি যে স্থানে খুব ভারী ভারী জিনিস স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হয়, সেস্থানে ক্রেণ না হইলে চলে না। লোহার কারখানায় অতি তপ্ত ও ভারি লোহার তাল স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে মানুষ ক্রেণ বিনা কিছুতেই পারিত না। আর এক সুবিধা ইহাকে

২৪ ঘণ্টা খাটান চলে; মানুষ বা পশুর পক্ষে উহা সম্ভব নহে। অনুভূতিহীন জড়পদার্থকে জড়শক্তি দিয়া চালাইয়া মানুষ অতি কঠিন কাজ আদায় করে।

৭

ফেরো-কংক্রীট (Ferro-Concrete)

মানুষের বাসগৃহের ক্রমোন্নতি

মানুষ প্রথমে বৃক্ষ কোটরে বাস করিত বা পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লইত। তাহার পর লতা পাতা ও বাঁশ দিয়া ঘর বাঁধিতে শিখিল। ক্রমে উহার প্রাচীরগুলিকে দৃঢ় ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে মাটি লেপিয়া দিত। তাহার পর মাটির দেয়াল দিয়া বাসগৃহ করিতে শিখিল।

কোন বুদ্ধিমান কারিগর দেয়ালগুলিকে ইচ্ছামত সুন্দর ও দৃঢ়ভাবে গড়িবার জন্য কাঁচা মাটির তালে খড়, শণ ইত্যাদির বাঁধন দিয়া ছোট ছোট সমান খণ্ডে কাটিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া লইয়া ঐ গুলিকে একটির উপর একটিকে আটাল মাটি দিয়া গাঁথিতে আরম্ভ করিল। প্রাচীনকালে মিশরে সাধারণের বাসগৃহ এইরূপ রৌদ্রপক্ক ইট দিয়া নির্ম্মিত হইত এবং ধনীর গৃহ প্রস্তর সাজাইয়া নির্ম্মাণ করিবার রীতি ছিল।

এখনও কাঁচা ইট দিয়া বাসগৃহ ভারতের বহুস্থানেই নির্ম্মিত হয়। তাহার পর মানুষ ইটকে রৌদ্রপক্ক না করিয়া আগুনে পোড়াইয়া অধিকতর দৃঢ় করিতে শিখিল। ইট দৃঢ় হইল বটে, কিন্তু একটি ইটের সহিত আর একটির বাঁধনরূপে সেই পুরাতন আটাল কাদাই ব্যবহৃত হইত।

ইট গাঁথিবার মসলা

মানুষ খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল যে একপ্রকার পাথর, শক্ত মাটি বা শামুক ইত্যাদির মত জলজ জীবের কঙ্কাল পোড়াইলে একপ্রকার শ্বেত চূর্ণ পাওয়া যায়। ইহাকে জল দিয়া মাখিলে দেখা যায় যে দিনকতক পরে শুকাইয়া পাথরের মত শক্ত হয়। মানুষ এতদিনে পোড়া ইট বা পাথর গাথিবার মসলা পাইল।

এই প্রকার মসলা কাদার মত সুলভ নহে, বহু শ্রমসাপেক্ষ। ফলে ধনী ব্যতীত অন্য কেহই ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। এই শ্বেত চূর্ণকেই লোকে চুণ বলে। কেবলমাত্র চূণের কাদায় ইট গাঁথিলে, পরে চূণ শুকাইয়া গিয়া ফাটিয়া যায়, উহার সহিত বালি বা ইটের ধূলি মিশাইয়া লইলে এইরূপ দোষ হয় না।

সিমেণ্ট

জলের সংস্পর্শে থাকিলেও গাঁথুনি দৃঢ় হইবে এবং জল উহা ভেদ করিতে পারিবে না—মানুষ এইরূপ উপাদান খুঁজিতে লাগিল। বর্ত্তমান সিমেণ্ট-মাটি সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছে। ইহা জমিয়া পাথরের মত হয়, ইহা দিয়া জল গলে না এবং ইহা জলের সংস্পর্শে থাকিলে দুর্ব্বল হওয়া দূরে থাকুক বরং অধিকতর দৃঢ় হইতে থাকে। ইহাকে কংক্রীট করা বলে।

কংক্রীট

ব্যবহার করিতে করিতে মানুষ দেখিল সিমেণ্টের সহিত বালি ও পাথরকুচি ঠিক অনুপাতে মিলাইয়া লইলে উহা শুকাইলে ঠিক একেবারে পাথরের মত শক্ত হয়। ইহার একটা মস্ত সুবিধা সিমেণ্ট, মাটি, বালি ও পাথরের কুচি কার্য্যের উপযুক্ত অনুপাতে মিশাইয়া জল দিয়া মাখিয়া বাঞ্ছনীয় ছাঁচে ঢালিয়া দিলেই দিনকতক পরে ছাঁচের আকারে জমিয়া পাথরে পরিণত হইবে। ক্রমশঃ কিন্তু এইপ্রকার গাঁথুনির একটী মস্ত দোষ প্রকাশ হইয়া পড়িল। এইরূপে কোন দ্রব্য বা গাঁথুনি বিশাল চাপেও (Compressive Strain) ভাঙ্গিয়া পড়ে না বটে,

কিন্তু অসাধারণ টানে (Tensile Strain) ছিঁড়িয়া যায়। অন্যদিকে ইস্পাত সস্তা হওয়ায় ক্রমশঃ ব্যবহার বাড়িতেছিল। লোকে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে ইস্পাতের কাঠাম বাঁধিয়া প্রাচীর আদি অংশ ইট দিয়া নির্ম্মাণ করে। ইহাতে গাঁথুনি দৃঢ় ও স্থায়ী হয় বটে, কিন্তু আগুন লাগিলে এক মহা বিপদ উপস্থিত হয়! ইস্পাতের কড়ি আগুনের তাতে অগ্নিতুল্য হইয়া বাড়ীর দরজা জানালা বরগা ইত্যাদি কাষ্ঠ নির্ম্মিত অংশগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেয়। ইস্পাত অগ্নির অতি উত্তম বাহন, ফলে আগুণ অতি শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়ে। দেখা গেল, কংক্রীট আগুনের এক নিকৃষ্ট বাহন। এই নিকৃষ্ট বাহন দিয়া উৎকৃষ্ট বাহনকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া দিলে আর আগুন ছড়াইবার ভয় থাকে না। এইরূপ লৌহ ও কংক্রীটের মিলিত গাঁথুনিকে ফেরো-কংক্রীট বলে।

ফেরো-কংক্রীট

লৌহ ও কংক্রীটের মিলন যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। লৌহের বিশাল টান সহ্য করিবার ক্ষমতা কংক্রীটের বিশাল চাপ সহ্য করিবার শক্তির সহিত মিলিত হওয়ায় গাঁথুনি হয় অতিশয় চাপ ও টান সহ। ফলে ভূমিকম্পের মত ভীষণ দুর্ঘটনায়ও এইরূপে প্রস্তুত গাঁথুনি দোলে, কাঁপে কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়ে না। ১৯২৩ খৃঃ টোকিওতে ভূমিকম্প হইবার সময় দেখা গেল ফেরো-কংক্রীটের বাড়ীগুলির কোন ক্ষতিই হয় নাই, অন্য বাড়ীগুলি ধূলিসাৎ হইয়াছে। আজকাল পৃথিবীতে গাঁথুনির কাজে ফেরো-কংক্রীটের ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ফেরো-কংক্রীটের কল্পনা নাকি ১৮৬৮ খৃঃ সর্ব্বপ্রথমে এক ফরাসী উদ্যান-রক্ষকের মাথায় আসে।

তিনি লোহার পাতলা ছড় দিয়া একটি বড় চৌবাচ্ছার কাঠাম করিয়া উহার চারিদিকে কাঠের একটি ছাঁচ গড়িলেন। তাহার পর ঐ ছাঁচে কংক্রীট (বালি, বিলাতি মাটি ও পাথরকুচি জল দিয়া মাখিয়া) ঢালিয়া দিলেন। কয়েকদিন

পরে কংক্রীট শুখাইয়া পাথরে পরিণত হইলে, তিনি ছাঁচের কাঁটাগুলি খুলিয়া লইয়া কাঠের তক্তাগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। এইরূপে লোহার ছড়ের বাঁধন দেওয়া কংক্রীটের চৌবাচ্ছা বহুদিন স্থায়ী হয় এবং ঐ আকারের পাথরের চৌবাচ্ছা অপেক্ষাও দৃঢ় হয়।

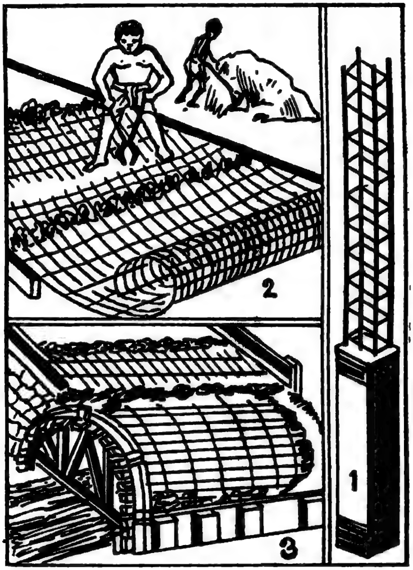

আজকাল রাস্তা, ঘাট, অট্টালিকা, থাম, খিলান, ড্রেন ইত্যাদি সকল প্রকার গাঁথুনিই ফেরো-কংক্রীট দিয়া হইতেছে। রাস্তায় লোহার মোটা তারের জাল মাঝে রাখিয়া জালের উপরে ও নীচে কংক্রীট ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাহা দিনকতক জলে ভিজাইয়া রাখিলে অতি দৃঢ় ও স্থায়ী পথ প্রস্তুত হয়। আজকাল ভারী ভারী লরী চলাচলের পক্ষে এইরূপ পথই উপযুক্ত।

পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণও ঐরূপেই করা হয়। নর্দ্দমার তলদেশ ফেরো-কংক্রীটে

জমাইয়া লইয়া, উহার উপরে অর্দ্ধগোলাকার কাঠের ছাঁচ নির্ম্মাণ করা হয়। তাহার পর লোহার তারের জালটি ছাঁচের উপরে মাঝামাঝি অবস্থায় আঁটিয়া কংক্রীট ঢালা হয়। ইহা জমিয়া গেলে কাঠের ছাঁচটি খুলিয়া লওয়া হয়।

আজকাল বড় বড় বাড়ীর মেঝে, ছাদ ইত্যাদিতে টালি আর ব্যবহার করা হয় না। ফেরো-কংক্রীট করা হয়।

লোহার ছড়ের বাঁধন ও ছাঁচে ঢালিয়া ইচ্ছামত আকারে জমাইয়া পাথরের অপেক্ষাও দৃঢ় নানাপ্রকারের গাঁথুনি আজকাল নির্ম্মাণ করা হয়। পূর্ব্বে নানা আকারের থামের জন্য নানা আকারের ইট প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লইতে হইত। বারান্দা বা অলিন্দের জাফ্‌রির কাজের জন্য বহু ব্যয়সাধ্য পাথর ব্যবহার বিনা কোন পথ ছিল না। আজকাল নানারকমের সুন্দর মনোমত থাম, রেলিং ইত্যাদি ফেরো-কংক্রীট দিয়া অতি শীঘ্র ও সুলভে প্রস্তুত করা হয়।

গত মহাযুদ্ধে মালবাহী জাহাজের অনটন হওয়ায় ফেরো-কংক্রীট দিয়া অতি শীঘ্র ও সুলভে জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইত। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এ বিষয়ে পথ দেখান। জার্ম্মান বৈমানিকেরা সম্প্রতি সস্তায় তৈয়ারি ফেরো-কংক্রীটের তেজস্বী বোমা নানা সহরে নিক্ষেপ করিতেছে।

৮

নদীতে বাঁধ

(১) নীল নদ

মিশর-ভূমি

পিরামিডের জন্মস্থান, অমিত বিক্রম ফারও নৃপতিদিগের কাহিনী বিজড়িত বিশাল মরুভূমিরাজ্য মিশর নীল নদের সৃষ্টি বলিলেও চলে।

মধ্য আফ্রিকার পার্ব্বতীয় হ্রদগুলির জল বর্ষায় কূল ছাপাইয়া নানা ধারায় বাহির হইয়া মিশরের মধ্য দিয়া সমুদ্রবক্ষে ফিরিয়া যাইবার জন্য যে পথে ছুটে, সেই

পথকেই আমরা নীল নদ বলিয়া জানি। এই পথ প্রায় ৪,০০০ মাইল দীর্ঘ। এই পথের প্রথমাংশ অনুর্ব্বর পর্ব্বতের বক্ষ ভেদ করিয়া গিয়াছে, তাহার পর দ্বিখণ্ডিত পর্ব্বতাংশ দুইটি ক্রমশঃ তীর হইতে সরিয়া যাওয়ায় নদীর উভয় কূলের কয়েক মাইল মাত্র উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে একশত মাইল দূরে এই নদী দুইটি ভিন্নপথে সমুদ্রে গিয়া পড়ায় একটি 'ব'দ্বীপ গড়িয়া উঠিয়াছে।

সমুদ্র হইতে আস্থয়ান পর্য্যন্ত ৭০০ মাইল ভূমিই প্রকৃত মিশর। তাহার দক্ষিণের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সুদান বলিয়া পরিচিত। বর্ষায় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া নীল নদ যে উর্ব্বর মৃত্তিকারাশি অনুর্ব্বর মরুভূমিতে রাখিয়া যায়, তাহাই মরা মরুবক্ষে প্রাণ আনে। দেশে বৃষ্টি হয় না, অতএব নদীর জল বাড়িয়া দুকূল ছাপাইয়া পর্ব্বত হইতে আনীত প্রাণ স্বরূপ মৃত্তিকা দিয়া মরুবক্ষ ঢাকিয়া দেয়। আবার বর্ষার শেষে নদী নিজ পুরাতন সীমাবদ্ধ পথে ফিরিয়া গেলে দেশে চাষ আরম্ভ হয়। মিশরে বর্ষাকাল নাই, তবে বন্যাকাল আছে; তাহার আয়ু জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত।

তাহার পর নদীর জল কমিতে থাকে, নদীর ধারে ধারে চাষ আরম্ভ হয়। এই সময় উত্তর দিক হইতে শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ করায় দেশে মধুর শীত অনুভূত হয়। এই ঋতুকে শীতকাল বলা চলে। ইহার আয়ুষ্কাল নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত। এই সময় পৃথিবীর নানাদেশ হইতে যাত্রীগণ এই দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে আসেন।

তাহার পর গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইলেই শস্য পাকিতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ সূর্য্যের তাপ বাড়িতে থাকে। পাহাড় ও মরুভূমির বিশাল বালুকারাশি তাতিয়া উঠিলে মনে হয়, সারা দেশটাই একটি বিরাট চুল্লিতে পরিণত হইয়াছে। দিনে মিশরবাসীগণ বাহির হইতে পারে না, তাহার উপর দক্ষিণ হইতে ঝড় উঠিলে আর রক্ষা নাই। উত্তপ্ত ঝড়ের মুখে বালির পাহাড় উড়িয়া আসিয়া সারাদেশে বাড়ী, ঘর, দুয়ার, আসবাবপত্র, সকল দ্রব্যই বালুকায় ঢাকিয়া দিয়া যায়। ঝড় থামিলেও জ্বালাকর তাপ কমে না। এই সময় বিরাট নীল নদের

বক্ষে বালির চড়া ভাসিয়া উঠে এবং নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। এই ঋতুকালের আয়ু মার্চ্চ হইতে জুন পর্য্যন্ত।

বাঁধের কল্পনা

বর্ষায় যে প্রচুর জলধারা নদীপথে নামিয়া সমুদ্রে গিয়া হারাইয়া ফেলে, উহা ধরিয়া রাখিতে পারিলে সারা বৎসরই চাষ আবাদ চলিতে পারে, এ কথা প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের মনে জাগিত, কিন্তু বর্ষায় নীলনদের দুর্দ্দান্ত রূপ দেখিয়া বাঁধ দেওয়া সম্ভব বলিয়া কোন কালে বোধ হয় নাই। বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে মানুষ দুর্দ্দান্ত নদে বাঁধ দিয়া উহাকে বশে আনিয়াছে।

বর্ত্তমানে নীলনদের চারিস্থানে বিশাল বাঁধ দিয়া বাঁধা হইয়াছে। প্রথম কায়রোর নিকটেই 'ব' দ্বীপের মুখে জিফ্‌টায় (Zifta), দ্বিতীয়টি আশুইট্‌-এ, তৃতীয়টি এসনেতে ও বৃহত্তমটি আসুআনে।

প্রথম বাঁধ

'ব' দ্বীপের মুখের বাঁধটী ফরাসী কারীগরেরা আরম্ভ করেন। বাঁধটি সম্পূর্ণ হইবার পর বর্ষার বিশাল জলরাশি ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবামাত্র দেখা গেল জলের বিশাল চাপে বাঁধটি কয়েকস্থানে ফাটিয়া গিয়াছে; আরও দিন কতক পরে দেখা গেল যে, জলের তোড়ে সম্পূর্ণ বাঁধটি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে!

কোটী কোটী টাকায় নির্ম্মিত বিশাল বাঁধটি রক্ষা করিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া মিশরাধিপতি মহম্মদ আলি প্রজাকুলকে বাঁচাইবার জন্য বাঁধটি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলাও মুখের কথা নয়, হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রায় ৭,৫০০,০০০ টাকা লাগিবে।

এই সময় স্যার কলিন মনক্রীফ্‌ (Sir Collin Moncrieff) ও বিখ্যাত সেচ্‌বিদ্যাপটু স্যার উইলিয়ম উইলকক্স (Sir William Willcocks)

বলিলেন যে তাঁহারা ঐ ব্যয়ে বাঁধটি সুদৃঢ় করিয়া দিবেন। মিশরাধিপতি তাঁহাদিগের উপর এই কার্য্যের ভার দিলেন। তাঁহাদিগের কৌশলে বাঁধটি রক্ষা পাইল। এই বাঁধের ফলে ৫০ লক্ষ বিঘারও অধিক জমিতে সারা বৎসর সেচের ব্যবস্থা হইল।

দ্বিতীয় বাঁধ

কায়রো হইতে ২৫০ মাইল দক্ষিণে আশুইট্ (Assuit), দক্ষিণ মিশরের প্রধান নগর। এই স্থানে অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ নীলনদের দ্বিতীয় বাধ দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধে বর্ষার জল ধরিয়া রাখায় প্রায় দেড় কোটী বিঘা জমিতে সারা বৎসর সেচ সম্ভব হইয়াছে।

তৃতীয় বাঁধ

ইহার আরও ২৪০ মাইল দক্ষিণে এস্নে (Esneh) বাঁধ। নীল নদের বর্ষার উদ্দাম প্লাবন সংযত করিবার উদ্দেশ্যে এই বাঁধটা দেওয়া হইয়াছে। তাহার আরও ১১০ মাইল পরে ভূমধ্যসাগর হইতে প্রায় ৭৫০ মাইল দূরে প্রথম খাড়ির মুখে আস্থয়ান বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

চতুর্থ বাঁধ

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আস্থয়ান বাধ দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার হইয়াছিল। এইস্থানে নীলনদ তিনদিকে গ্রানাইট পাহাড়ে বেষ্টিত এবং পাহাড়ের কোলে কোলে নদ বহিয়া চলায় বাঁধের ভিত্তি গাথিবার জন্য আর নদীগর্ভে খুঁড়িতে হয় নাই। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে নদ পাচটী বিভিন্ন খাড়ি পথে ঘণ্টায় ১৬ মাইল বেগে ছুটিতেছে, ফলে উহার ভয়ঙ্কর রূপ ও গর্জ্জন প্রায় নায়গ্রা জলপ্রপাতেরই অনুরূপ।

বাঁধটী দিবার পূর্ব্বে নিকটস্থ মরুভূমিতে ২০,০০০ মজুর ও ওস্তাদ কারিগরের বাস করিবার উপযুক্ত একটি নগর স্থাপন করিতে হইল। উহাতে একটি বড় কারখানা, হাঁসপাতাল, পোষ্ট অফিস, বাজার ইত্যাদি নগরের যাবতীয় সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইল।

গ্রীষ্মকালে মরুভূমির উত্তাপে কাজ করিতে করিতে সর্দ্দিগর্ম্মিতে মানুষ মারা পড়িতে পারে, সেইজন্য উহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইল। সর্দ্দিগর্ম্মির প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিকটে নিকটে বহু তাঁবু খাটান হইল। এই সকল তাঁবুতে স্নানাগার, প্রচুর বরফ ও ডাক্তার ডাকিবার জন্য টেলিফোনের ব্যবস্থা হইল। বাঁধ-নির্ম্মাতাদিগের অতি সতর্ক দৃষ্টির ফলে ঐরূপ প্রাণান্তকর গ্রীষ্মে কাজ করিয়াও একটি লোকও সর্দ্দিগর্ম্মিতে মরে নাই।

এইস্থানে বাঁধের পক্ষে বহু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রধান অন্তরায় ছিল অসম্ভব জলের তোড়। গ্রীষ্মকালে যখন নীল-নদের জল পাচটী ধারায় পাঁচটী গভীর খাতে প্রবাহিত হয়, তখনও জলের এত তোড় যে ৩৫০ মণ ভারী প্রস্তরখণ্ড উহাতে ফেলিয়া দিলে উহাকেও খড় কুটার মত ভাসাইয়া লইয়া যায়। যখন কারিগরেরা দেখিলেন ঐরূপ বৃহৎ পাথরের টুকরাও জলের তোড়ে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, তখন তাঁহারা মালগাড়ীতে ঐরূপ কয়েকটী ভারী পাথরের টুক্‌রা তারের দড়ি দিয়া একত্রে বাঁধিয়া গাড়ীটাকে নদীতে ফেলিয়া দিতেন। এইরূপে বহু আয়াসে একটি ধারায় বড় বড় পাথরের টুক্‌রা ফেলিয়া ফেলিয়া অস্থায়ীভাবে উহার মুখ বন্ধ করা হইল। তাহার পর আর একটু দূরে ঐরূপ আর একটি অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হইল। এইবার দুইটি বাঁধের মাঝের জল পাম্প করিয়া তুলিয়া ফেলিয়া বর্ষাগমের পূর্ব্বেই ফেরো-কংক্রীটের দৃঢ় ভিত্তি গাঁথিয়া তোলা হইল। এই স্থায়ী ভিত্তির অগ্র ও পশ্চাতে অস্থায়ী বাঁধ থাকায় বর্ষার জলের প্রবল তোড়েও ভিত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

প্রতি গ্রীষ্মকালে এক একটি ধারায় এইরূপে দৃঢ় ফেরো-কংক্রীটের ভিত্তি গাঁথিয়া তোলা হইল। তাহার পর, এই ভিত্তির উপরে পাথর দিয়া বাঁধ গাথা খুব বেশী শক্ত নহে। এই বাঁধটি দৈর্ঘ্যে সওয়া মাইল, নদীগর্ভ হইতে মাথা পর্য্যন্ত উচ্চে ১২০ ফুট, পাদদেশে বাঁধটি ১০০ ফুট চওড়া ও উহা সরু হইতে হইতে শীর্ষদেশে গিয়া ২৪ ফুটে দাঁড়াইয়াছে। ইহার মাথায় একটি পথ নির্ম্মিত হওয়ায় হাঁটিয়াই নদী পারাপার হইতে পারা যায়।

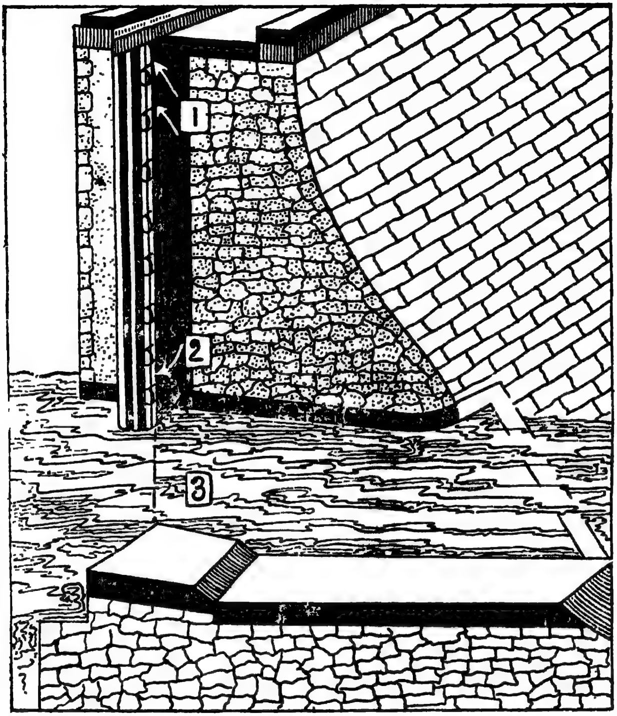

বাঁধের নর্দ্দমার পরিচয়—(১) দ্বারে রোলার থাকার দ্বারটি অল্প আয়াসেই খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারা যায়। (২) লৌহ দ্বারটি তোলা হইয়াছে। (৩) ফলে নর্দ্দমা দিয়া নদের জল বেগে ছুটিয়া চলিবার পথ পাইয়াছে।

ইহার গায়ে ১৮০টি নর্দ্দমা আছে, ঐগুলি প্রয়োজন হইলে লৌহদ্বারের সাহায্যে অনায়াসেই খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়। ঐগুলির মধ্যে ১৪০টি লৌহ-দ্বার (Lockgate) ২৩ ফুট লম্বা ও ৬॥০ ফুট চওড়া।

এই বাঁধটির নির্ম্মাণ কার্য্য ১৯০২ খৃঃ শেষ হয়। সারা বৎসর জল পাওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় জলের চাহিদা বাড়িয়াই চলিল। ফলে অধিক পরিমাণে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য মিশরের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ বাঁধটিকে আরও ২৩ ফুট উচ্চ করিতে আদেশ দিলেন।

১৯০৭ খৃঃ এই নূতন কাজে হাত দেওয়া হয়, সহস্র সহস্র মজুর ও কারিগর ৫ বৎসর দিবারাত্র খাটিয়া ইহাকে আরও ২৩ ফুট উচ্চ করিতে সক্ষম হয়। বাঁধটি ২৩ ফুট উচ্চ করিলে পূর্ব্বের তুলনায় আড়াই গুণ জল ধরিবে, ফলে ধরা জলের বিশাল চাপও বহুগুণ বাড়িবে; সেইজন্য বাঁধের মাথার উপর গাঁথিয়া উচ্চ করিলে বাঁধটি জলের বিশাল চাপে কালে ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত। এই বিপদ এড়াইবার জন্য কারিগরেরা প্রথমেই পূর্ব্বের মত নদীগর্ভে বাঁধটির পাদদেশ পূর্ব্বাপেক্ষা চওড়া করিয়া গাঁথিয়া উহাকে দৃঢ়তর করিলেন। বাস্তবে বাঁধের প্রথম ভিত্তির পাশে আর একটি ভিত্তি গাঁথা হইল। পুরাতন ভিত্তিটি সাত বৎসরে জমিয়া বসিয়া নদীগর্ভস্থ পাথরের উপর আপনার স্থায়ী স্থান করিয়া লইয়াছিল। তাহার একেবারে গা ঘেঁসিয়া নূতন ভিত্তির উপরে পুরাতন বাঁধের মাথা পর্য্যন্ত গাঁথিয়া তুলিয়া তাহার পর উভয়ের উপরে যদি ২৩ ফুট নূতন গাথুনি দেওয়া হইত, তাহা হইলে কিছুদিন পরে এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইত।

নূতন ভিত্তিটি কয়েক বৎসরে ক্রমশঃ বসিয়া ফাঁপিয়া একটা নূতন আকার গ্রহণ করিবে, ইহাই হইবে ইহার স্থায়ী আকার; কিন্তু পুরাতন বাঁধটি পূর্ব্বেই স্থায়ী আকার গ্রহণ করায় আর কোন পরিবর্ত্তনই হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ফলে মাথার ২৩ ফুট গাথুনির অর্দ্ধেক অংশ থাকিত স্থায়ী বাঁধের উপর এবং অপর অংশ থাকিত অস্থায়ী বাঁধের উপর। কালে অস্থায়ী বাঁধের আকারের পরিবর্ত্তন ঘটিলে মাথার নূতন গাথুনির ভিত্তি দুইটী অসমতল হওয়ায় চাড়ে ফাট ধরিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত এবং কালে ভাঙ্গিয়া পড়িত। সেইজন্য কারিগরেরা নূতন ভিত্তি গাঁথিবার সময় এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন।

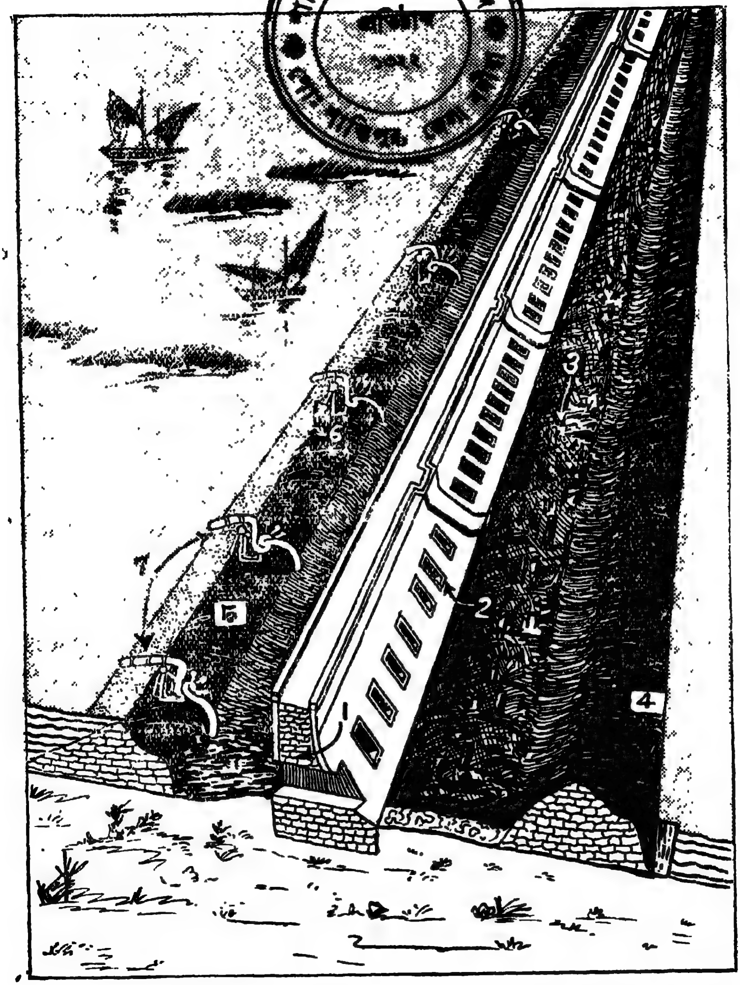

পুরাতন বাঁধের উপর নূতন বাঁধ দেওয়া হইতেছে

(১) পুরাতন বাঁধের অংশ। (২) বাঁধের নর্দ্দমা। (৩) ও (৬) নদের শুষ্ক তলদেশ। (৪) পাথরের অস্থায়ী বাঁধ। (৫) জল ছেঁচিয়া ফেলিবার জন্য পাম্প।

তাঁহারা পুরাতন বাঁধের গায়ে ছিদ্র করিয়া বহু লোহার কড়ির একপ্রান্ত গাঁথিয়া দিলেন। তাহার পর নূতন ভিত্তিটি দুই হইতে ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত সরাইয়া গাঁথিতে লাগিলেন এবং ঐ কড়িগুলির অন্য প্রান্ত এই নূতন গাঁথুনির সহিত আঁটিয়া দিলেন। পুরাতন ও নূতন বাঁধের মাঝে দুই হইতে ছয় ইঞ্চি ফাঁক রহিল এবং দুইটী বাঁধ অসংখ্য লোহার কড়ির বাঁধনে পরস্পর বাঁধা পড়িল।

তাহার পর কয়েক বৎসর পরে নূতন বাঁধটি পুরাতনের মত স্থায়ী আকার ও আসন গ্রহণ করিলেও বাঁধনের লোহার মাঝে মাঝে কড়িগুলি বাঁকিয়া যাওয়া ছাড়া পুরাতন বাঁধটির আর কোন ক্ষতি হইল না। তাহার পর দুইটী বাঁধের মাঝের ফাঁক সিমেণ্ট ও পাথরকুচি দিয়া ভরাট করিয়া দেওয়া হইলে উহারা এক হইয়া গেল। এই সিমেণ্ট জমিয়া পাথর হইলে পর উভয়ের মাথার উপরে ২৩ ফুট নূতন গাঁথুনি তোলা হইল।

প্রথম বাঁধে একশত কোটী টন জল ধরিত; ১৯১২ খৃষ্টাব্দে. দ্বিতীয় বারে বাঁধটী ২৩ ফুট উচ্চ করায় ২৫০ কোটী টন জল ধরিল। ইহার ফলে এক কোটী বিঘা তৃষ্ণার্ত্ত মরুপ্রান্তর জল পাইয়া বাঁচিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁধটি পুনরায় ৩০ ফুট উচ্চ করা হইতেছিল, বোধ হয় এতদিনে কার্য্য শেষ হইয়া থাকিবে। তৃতীয়বার বাঁধটি উচ্চ করার ফলে ৪৮০ কোটী টন জল ধরিয়া রাখা চলিবে। এই নূতন বাঁধের ফলে ২৩০ মাইল দীর্ঘ এক হ্রদ সৃষ্টি হইয়াছে এবং নির্ম্মম সর্ব্বনাশকর মরুভূমির কবল হইতে ১ কোটী বিঘা নূতন জমি কাড়িয়া লইয়া প্রাণবন্ত করা হইয়াছে।

(২) সিন্ধুনদ

এই নদ ১৮,০০০ ফুট উচ্চে তিব্বতে জন্মিয়া হিমালয় পাহাড়ের কোলে কোলে বহিয়া কয়েকটী খাড়ি দিয়া কাশ্মীর প্রদেশে উপস্থিত হয়। তাহার পর বুনজির (Bunji) নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে বাঁকে এবং পঞ্জাবের আটকের (Attock) নিকটে কাবুল হইতে আগত কাবুল নদীর জলধারার

সহিত মিশে। পাঞ্জাবের কয়েকটি নদীর জল আসিয়া মিথানকোটে (Mithankote) সিন্ধুনদে পড়ে এবং তাহার পরই উহা সিন্ধুর সমতল ভূমিতে পড়িয়া আরব সাগর অভিমুখে ছুটিতে থাকে।

পাহাড়ে পাহাড়ে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া সিন্ধুনদ আটকে পৌছিলে উহাতে নৌকা চলাচল সম্ভবপর হয়। কিন্তু বর্ষাকালে নদের দুপাশে পূর্ব্বে ভীষণ প্লাবন দেখা দিত। বর্ষাকালে নদে ভীষণ বন্যা, অথচ অন্য সময় জলাভাবে উহার স্থানে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে জলাভাবে হাহাকার উঠে এবং মাঠে তপ্ত বালির তুফান ছুটে। ফলে সিন্ধু প্রদেশের অধিকাংশ স্থান আজ মরুভূমি। বর্ষার বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে গ্রীষ্মকালে জলের হাহাকার ঘুচে এবং শুষ্ক নিষ্করুণ তপ্ত মাঠগুলিকে শস্যশ্যামল সরস শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যে সিন্ধুনদে লয়েড বাঁধ দিয়া ইহার বন্যার জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সিন্ধুনদ দৈর্ঘ্যে ১৮০০ মাইল। সমস্ত সিন্ধুপ্রদেশ ও আংশিক পাঞ্জাবের ৩৭২,০০০ বর্গমাইল ভূভাগের উপর যে বৃষ্টিপাত হয়, উহা সিন্ধুনদ দিয়াই সমুদ্রে গিয়া পড়ে। এক কথায় সিন্ধুনদ এই বিস্তৃত ভূভাগের নিকাশি ড্রেনের কাজ করে।

ভারতের দুর্ভিক্ষ

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মুখে দেশে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হওয়ায় কেহই আর দেশের সেচ্ প্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখিবার অবসর পাইত না। ফলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত এবং লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইত।

১৮৭৪ খৃঃ (চুয়াত্তরের মন্বন্তর) বাংলাদেশে দশ লক্ষের অধিক লোক খাদ্যাভাবে মারা যায়। ১৮৭৭ খৃঃ সমগ্র ভারতের ঐরূপ দুর্দ্দশা হয়। ১৮৯৬-৯৭ খৃঃ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস ভারতে ২,৫০০,০০০ অধিক লোক গ্রাস করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের

দুর্ভিক্ষে ত্রিশ লক্ষের অধিক লোক খাদ্যাভাবে মারা পড়ে এবং প্রায় নয় কোটী লোক না খাইয়া বা সামান্য কিছু খাইয়া বাঁচিয়াছিল।

বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ দেশের এই ব্যাধির প্রতিকারকল্পে দুইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন :

(১) একস্থানের প্রচুর শস্যসম্ভার আর এক অভাবগ্রস্ত স্থানে লইয়া যাইবার জন্য রেলপথের বিস্তার।

(২) বাংলা ও উড়িষ্যা ব্যতীত আর সকল প্রদেশে বড় বড় নদীতে বাঁধ দিয়া এক দিকে বন্যা হইতে প্রজাকুল রক্ষা করা এবং অন্য দিকে ধরা জলে সারাবৎসর চাষ আবাদ করা।

সিন্ধুনদের বাধ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৯ বৎসর লাগিয়াছে এবং বিশ কোটীর অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং ইহার গায়ে ৬৬টী জল ছাড়িবার দ্বার আছে। দ্বারগুলি লৌহনির্ম্মিত ও প্রত্যেকটি ৫০ টন ভারী। প্রতি দ্বারটি তিন শত টনের অধিক জলের চাপ সহ্য করিতে পারে। সিন্ধুনদের বন্যার বিশাল জলভার ধরিয়া রাখিয়া প্রয়োজন মত বহু খালে জল ছাড়া হয়। তৃষিত মরুবক্ষে জল লইয়া যাইবার জন্য বহু ছোট বড় খাল কাটিতে হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও যে ভূভাগ ভয়ঙ্কর মরুপ্রান্তর ছিল, আজ সে স্থানে ৬,১৬৬ মাইল খাল-পথে প্রাণপূর্ণ জল গিয়া প্রায় আড়াই কোটী বিঘা জমি প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। ফলে খালের দুই পাশে শত শত নূতন গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। বৎসরে সেখানে আজ প্রায় ত্রিশ কোটী টাকা মূল্যের গম, যব, চাউল, তুলা ও আখ জন্মায়।

সিন্ধুদেশের মতন জনমানবহীন শ্বাপদসঙ্কুল মরুভূমিতে সকল জিনিষ বহিয়া লইয়া গিয়া অল্পে অল্পে লয়েড বাঁধের মত বিশাল গাথুনি গাথিয়া তোলায় যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় কারিগর দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

(৩) হুভার বাঁধ

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (U. S. A.) গ্রীন নদীর জন্ম য়োমিং (Wyoming) পাহাড়ে এবং গ্রাণ্ড নদীর জন্ম কোলোরাডো পাহাড়ে; এই দুইটী নদীর মিলিত স্রোত কোলোরাডো নামে পরিচিত। এই নদীটী ২২০০ মাইল দীর্ঘ, কিন্তু ইহার মধ্যে হাজার মাইল পাহাড়ের কোলে কোলে পথ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পার্ব্বত্যপথে পথ কাটিতে গিয়া বহু গভীর গিরিখাত গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নদী শুষ্ক নিষ্করুণ মালভূমি দিয়া বহিয়া আরিজোনা (Arizona) প্রদেশের বিখ্যাত গিরিখাত, গ্রাণ্ড কেনিয়ন্ (Grand Canyon) ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং তাহার পর ক্যালিফোনিয়ার মধ্য দিয়া গিয়া ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে পড়িয়াছে।

ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশস্থ ইম্পিরিয়াল উপত্যকা (Imperial Valley) উক্ত নদীর পথে পড়ে। এই স্থানে লক্ষাধিক লোকের বাস এবং বৎসরে প্রায় ২৫ কোটী মুদ্রারও অধিক মূল্যের ফসল জন্মে। এই ভূখণ্ড সমুদ্র পৃষ্ঠ অপেক্ষা নিম্নভূমি এবং নদীগর্ভ হইতেও ১০০ হইতে ৩৫০ ফুট পর্য্যন্ত নিম্নভূমি বলিয়া উল্লিখিত উচ্চ পাহাড়গুলিতে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলেই মহা বিপদ উপস্থিত হয়। কোলোরাডো নদী হঠাৎ অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠিয়া সর্ব্বনাশকর রূপ গ্রহণ করে। তখন উর্ব্বর ও সম্পদশালী ইম্পিরিয়াল্ উপত্যকা রক্ষা করা এক মহা সমস্যা হইয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে ঐ প্রদেশ ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নদী হঠাৎ কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও সর্ব্বনাশা হইয়া উঠে, তাহার দুই একটী ঘটনা এই স্থানে বলিয়া রাখি। ১৯০৫ খৃঃ পাহাড়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় পার্ব্বত্য-প্রদেশে নদী দুকূল ছাপাইয়া উঠিল। ফলে বন্যার ভীষণ স্রোতে নদী নূতন পথে মরুভূমি দিয়া ৭০ মাইল গভীর খাত কাটিয়া সাল্টন (Sulton) সমুদ্রে গিয়া মিশিল, এই অতিরিক্ত জলরাশি পাইবার ফলে উক্ত হ্রদের জল ছাপাইয়া উঠিয়া চারিদিকের দশ লক্ষ বিঘা ভুমি গ্রাস করিল। তাহার পর ১৯২২ খৃঃ জুন

মাসে নদীর বন্যায় পালো ভার্দে (Palo Verde) উপত্যকার অর্দ্ধেক ভাগ গ্রাস করে। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই ডুবিয়া নষ্ট হইল এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন হইল।

এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে কোলোরাডো নদীকে বাঁধিয়া বশে আনা দরকার। এই অতিশয় ব্যয়সাধ্য কার্য্যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ হাত দিয়াছেন। এই অসম্ভব কাজ শেষ করিতে প্রায় শতাধিক কোটী টাকা ব্যয় হইবে। এই বাঁধই হুভার বাঁধ নামে পরিচিত।

হুভার বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে ইম্পিরিয়াল্ ও কোচিলা (Coachilla) উপত্যকা দুইটী বন্যার গ্রাস হইতে বাঁচিবে এবং ৬০ লক্ষ বিঘা অনুর্ব্বর মরুভূমি উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইবে। উচ্চ ভূমিতে ধরা জল সংযত জলপ্রপাতরূপে নামিয়া আসিবার কালে ডায়নামো চালাইয়া ১৮ লক্ষ অশ্বশক্তি তুল্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করান চলিবে। তাহার উপর ঐ বাঁধ হইতে জল পাইয়া ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাংশের নগরগুলির বহু দিনের পানীয় জলের অভাব মিটিবে।

ওস্তাদ্ কারিগরেরা লাস্ ভেগাস্ (Las Vegas) হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ব্ল্যাক কেনিয়ন গিরিখাতে বাঁধ দিতেছেন। এই স্থানে গিরিখাত অর্দ্ধ মাইল গভীর এবং নদী এই পথে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই স্থানে বাঁধ দিলে নদীকে চিরতরে শান্ত করিতে পারা যাইবে, এই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

বাঁধের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মজুর ও কারিগরের থাকিবার জন্য বাঁধের ছয় মাইল দূরে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বুলডার নগর নামক একটি উপনিবেশ গঠন করা হইয়াছে। এই নগরে (Boulder City) ২৫০০ মজুর ও কারিগরের সকল সুখ-সুবিধার জন্য গির্জ্জা, দোকান, ব্যাঙ্ক, স্কুল, জলের কল, ইলেকট্রিক্ লাইট, মায় সিনেমার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা আছে।

নদীর দুইপাশে অর্দ্ধমাইল উচ্চ খাড়া পাহাড়। এই স্থানে নদীর ক্ষুরধার বেগকে প্রশমিত করিতে না পারিলে বাঁধ দেওয়া অসম্ভব। এইজন্য কারিগরেরা প্রথমেই

উভয়দিকে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি সুড়ঙ্গ কাটিতেছেন। সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে চারিটীর ব্যাস হইবে ৫০ ফুট, ৪৮টীর ব্যাস ৮৷৷০ হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত এবং উহারা দৈর্ঘ্যে হইবে তিন মাইল। যে স্থানে বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে, ঐস্থান হইতে কিছু আগে সুড়ঙ্গগুলির একটি মুখ ও কিছু পশ্চাতে অপর মুখটি থাকিবে।

সুড়ঙ্গগুলি কাটা হইবার পর গ্রীষ্মকালে ক্ষীণকায়া নদীপথে পাথর ও মাটি দিয়া অস্থায়ী বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে; তখন উক্ত সুড়ঙ্গগুলির পথে নদীর জল প্রবেশ করিয়া বাঁধের নির্দ্দিষ্ট স্থানটীকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আবার নিজ পথে বহিয়া চলিবে। ইহা ব্যতীত বর্ষাকালের অতিরিক্ত জল পাছে উক্ত ৫২টী সুড়ঙ্গপথে বাহির হইতে না পারিয়া অস্থায়ী বাঁধটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্যে বাধা জন্মায়, সেইজন্য পাহাড়ের কোলে কোলে বাঁধ দিয়া ১১টী বড় হ্রদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

দিবারাত্র ধরিয়া সুড়ঙ্গ কাটা চলিতেছে এবং গড়ে দিনে ২৫০ফুট দীর্ঘ সুড়ঙ্গ কাটা হইতেছে। সুড়ঙ্গগুলি কাটিতে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

তাহার পর বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে। বাঁধটী ফেরো-কংক্রীটে নিম্মিত হইবে। সম্পূর্ণ বাঁধটি উচ্চে ৭৩০ ফুট এবং প্রস্থে পাদদেশে ৬৫০ ফুট হইতে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে শীর্ষদেশে গিয়া মোটে ৪৫ ফুট থাকিবে। বাঁধটী মোট ১১৮০ ফুট দীর্ঘ হইবে। এই ১১৮০ ফুট গিরিখাত বন্ধ করিতে পারিলে নদীর জল পাহাড়ের কোলে জমিয়া ১১৫ মাইল দীর্ঘ ও ৮ মাইল প্রস্থ এক বৃহৎ হ্রদে পরিণত হইবে। হ্রদের পরিসীমা হইবে ৫৫০ মাইল এবং উহাতে প্রায় ৯ কোটী বিঘা-ফুট জল ধরিবে *।

নায়গ্রা জলপ্রপাতে যতখানি বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় ঠিক্ ততখানি বিদ্যুৎ-শক্তি এই স্থানে পাওয়া যাইবে। বিদ্যুতের কারখানা (Power Station) করিতে প্রায় দশ কোটী টাকা ব্যয় হইবে।

---

* এক বিঘা স্থানে এক ফুট গভীর জলের পরিমাণকে এক বিঘা-ফুট বলে।

ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনা ও নেভাদা নগরগুলিতে উক্ত বিদ্যুৎশক্তি বিক্রয় করিয়া বহু টাকা আয় হইবে। হুভার বাঁধ হইতে পাহাড়ের মাথায় মাথায় ও মরুভূমির মধ্য দিয়া ২৬৫ মাইল দীর্ঘ পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া লস্ এঞ্জেল্‌স্ (Los Angeles) নগরে পানীয় জল লইয়া গিয়া বিক্রয় করা চলিবে। ইহাতেও বেশ আয় হইবে।

তাহার উপর বর্ত্তমানে সাধারণ নদীর মত গভীর ও চওড়া কয়েকটি খাল কাটিয়া ক্যালিফোনিয়া প্রদেশের ইম্পিরিয়াল ও কোচিলা উপত্যকা দুটিতে জল লইয়া গিয়া লক্ষ লক্ষ বিঘা মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করিয়া তোলা হইবে। ভবিষ্যতে ইহাতেও আয় কম হইবে না। ভবিষ্যতে আরিজোনা ও নেভাদা প্রদেশের তৃষিত অংশগুলির তৃষ্ণা মিটাইবার সম্ভাবনাও রহিল। তখন আরও আয় বাড়িবে।

নদী যেরূপ দুর্দ্দান্ত, তাহাকে বাঁধিবার চেষ্টাও সেইরূপ বিশাল। কারিগরের অদ্ভুত পরিকল্পনার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে এই অদ্ভুত বাঁধ হইতে যে আয় হইবে উহাদ্বারা এই বিশাল পরিকল্পনার বিপুল ব্যয় জন্য ঋণ ৫০ বৎসরে তাঁহারা পরিশোধ করিতে পারিবেন।

খালপথ

(১) সুয়েজ

অনুর্ব্বর ভূ-খণ্ডে জল সেচের জন্য খাল কাটিয়া নদীর জল লইয়া যাইবার ব্যবস্থার কথা মানুষের মনে প্রথমে উঠে। তাহার পর মনে উঠা অস্বাভাবিক নহে যে, খালগুলি যদি গভীর ও বিস্তৃত করিতে পারা যায় তাহা হইলে নৌকা চলাচল করিতে পারা যাইবে এবং লোক ও মাল বহনের যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

তীব্র প্রয়োজনের অনুরোধেই যে মানুষের মাথায় বুদ্ধি খেলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এ বিষয়ে চীনেরা অগ্রণী বলিলেই হয়। উহাদিগের দেশের বৃহত্তম খালটি (Grand Canal) প্রায় হাজার মাইল দীর্ঘ। ইহা খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কাটা হয় এবং এখনও নষ্ট হয় নাই। খৃষ্ট জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিশরবাসিগণ একটি খাল কাটিয়া নীল নদের সহিত লোহিত সাগরের যোগ সাধন করেন, ফলে ইয়োরোপবাসিগণ তখন জল পথেই ভারত মহাসাগরে আসিতে পারিত। কালে রাজশক্তির সতর্ক দৃষ্টির অভাবে মরুভূমির বালির স্তুপ উড়িয়া আসিয়া উহাকে সম্পূর্ণ ভরাট করিয়া ফেলে। সিনাই উপদ্বীপের বক্ষে উহার চিহ্ন আজিও কোথাও কোথাও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমস্ত আফ্রিকা পরিক্রম করিয়া ভাস্কো-ডি-গামা সেকালের লক্ষীর ভাণ্ডার ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিলে ইয়োরোপবাসীদিগের দৃষ্টি এ বিষয়ে পুনরায় আকৃষ্ট হইল। ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মাঝে মোটে ১০০ মাইল দীর্ঘ ভূখণ্ড। ইহাকে কোন রকমে কাটিয়া খালপথ করিতে পারিলে পথ কত যে সুগম ও সুলভ হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এ পরিকল্পনার মস্ত অন্তরায় নিষ্করুণ মরুভূমি। যে স্থানে নিয়ত ঝড়ের মুখে লক্ষ লক্ষ বস্তা বালি উড়িতেছে, সেখানে খাল কাটিয়া উহাকে কয়দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারা সম্ভব? তাহার উপর মরুভূমির আলগা বালির মধ্যে খাল কাটা কি সম্ভব? কাটিতে না কাটিতে পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কাটা অংশ বুজাইয়া যে দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ঐরূপস্থানে অসংখ্য মজুর ও কারিগরের পানীয় জল, আহার, বাসস্থান ইত্যাদি বহু প্রয়োজনের কি করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে? এই পরিকল্পনা কোন পাগলের মাথায় উদয় হইলেও এমন ত পাগল দেখা যায় না যে লাভের আশায় উহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু এইরূপ এক ফরাসী পাগল খাল কাটিতে সঙ্কল্প করিলেন। পাগলের নাম (Ferdinand de Lesseps) ফার্দ্দিনান্দ্ দে লেসেপ্স্। ইংরাজ বৈশ্যজাতি, বৈশ্য-জাতি বড় হিসাবী ও কৃপণ হয়। বুদ্ধিমান ইংরাজ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া উহাকে অসম্ভব চেষ্টা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। প্রথম প্রথম কেহই তাহাকে ঐ চেষ্টায় অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে রাজি হইলেন না। এই খাল কাটা হইলে ইংরাজের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা, উহাকে আর আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারত, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভূ-খণ্ডে যাইতে হইবে না। কিন্তু টাকার মায়া বড় মায়া, অনিশ্চিত লাভ ও সুবিধার আশায় ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কোন রকমে কিছু দিতে সম্মত হইলেন না। ইংরাজের আর একভয় হইল ভারতের পথ দূর ও দুর্গম বলিয়া তাহারা নির্ব্বিঘ্নে উহা ভোগ করিতে পারিতেছে; খালপথে উহা নিকট ও সুগম হইলে ইয়োরোপের অন্যান্য দুর্দ্দান্ত জাতি আসিয়া উহাতে ভাগ বসাইতে পারে। এ ধারণা যে ভুল তাহা পরে প্রমাণিত হইল।

কিন্তু ফার্দ্দিনান্দ দমিবার পাত্র ছিলেন না। দুই বৎসরের অবিরাম চেষ্টায় ফরাসী জাতির ও মিশরবাসীর নিকট হইতে কাজ আরম্ভ করিবার মত তিনি অর্থ সাহায্য পাইলেন। তাঁহার খালের পরিকল্পনা তৎকালের বড় বড় কারিগর পরীক্ষা করিয়া উহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। কাজ আরম্ভ করা হইল।

খাল কাটার সকল বাধাই তিনি অতিক্রম করেন, কিন্তু যখন অবিরাম আল্গা বালির পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিত তখন তাহার মত দৃঢ়সঙ্কল্প ও অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তিও মাঝে মাঝে নিরাশ হইয়া পড়িতেন। ১৮৬৯ খৃঃ এই খালের খনন কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ভগবৎ কৃপায় তিনি ১৭ই নভেম্বর ১৮৭৫ খৃঃ এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। প্রথম দিনে ৬৮টী জাহাজ, সর্ব্বাগ্রে ফরাসী সম্রাজ্ঞীর জাহাজ খানি রাখিয়া, এইপথে যখন ভূমধ্যসাগর হইতে লোহিতসাগরে আসিয়া পড়িল, তখন অদ্ভুতকর্ম্মা ফার্দ্দিনান্দের প্রশংসায় জগত মুখর হইয়া উঠিল। ব্যয় হইল প্রায় বিশকোটী মুদ্রা কিন্তু

সুখ সুবিধা ও লাভের তুলনায় এই ব্যয় অকিঞ্চিতকর। ভয়ঙ্কর মরুপ্রান্তরের ভয় কাটিল; পথ সুগম ও সুলভ হইল। এক পাগল আর এক দুর্দ্দান্ত পাগলকে বশে আনিয়া শান্ত করিল।

এই খালটি দৈর্ঘ্যে ১০১ মাইল, গভীরতা কোথাও ৩৩ ফুটের অল্প নহে এবং প্রস্থে ১৯৮ ফুট হইতে ৩৫০ ফুট পর্য্যন্ত। ২৭০০০ টনের জাহাজ পর্য্যন্ত এই পথে চলাচল করিতে পারে এবং রাত্রে সন্ধানী আলো (Searchlight) জ্বালিয়া ১৫ ঘণ্টায় খালটি পার হয়।

ইংরাজ বড় ধূর্ত্ত। সে দেখিল যে তাহার হিসাবে ভুল হইয়াছে এবং খালের পরিকল্পনা মোটেই পাগলামি নয়; উহা হইতে প্রচুর আর্থিক লাভ ত হইবেই, অধিকন্তু ঐ খালপথ ভবিষ্যতে তাহার সাম্রাজ্যের চাবিকাটিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। তখন হইতেই সে খালের আর্থিক অংশীদার হইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়; খুব শীঘ্রই সুযোগ জুটিল। ১৮৭৫ খৃঃ মিশরাধিপতি খেদিভের অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি সুয়েজ খালের তাঁহার নিজ অংশগুলি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সুযোগে ইংরাজ খেদিভের সকল অংশগুলি উচ্চমূল্যে কিনিয়া লইয়া খালের উপর আংশিক কর্ত্তৃত্ব লাভ করিল। এখনও খাল কোম্পানীর অধিকাংশ কর্ত্তৃপদ অবশ্য ফরাসীদিগের হাতে, উহার প্রধান কার্য্যালয়ও (Head office) প্যারিস্ নগরে; কিন্তু মিশর ও প্যালেষ্টাইনের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি ইংরাজের হাতে থাকায় উহা এখন ইংরাজদের করায়ত্ত বলিলেই চলে।

এই খালের লোহিত সাগরের মুখে সুয়েজ বন্দর (Port Suez) এবং ভূমধ্যসাগরের মুখে সৈয়দ বন্দর (Port Said)। সুয়েজ বন্দরের সহিত মিশরের রাজধানী কায়রো ও সৈয়দ বন্দরের রেলপথে সংযোগ আছে।

(২) পানামা

সুয়েজ খালের কৃতকার্য্যতায় ফার্দ্দিনান্দের আমেরিকায় ডাক পড়িল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝে মাত্র ৪০ মাইল ভূখণ্ড। ইহাকে কাটিয়া আট্‌লান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের যোগ করিয়া দিতে পারিলে বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের খুব সুবিধা হয়।

তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। এই বয়সে তিনি ছুটিলেন আমেরিকায়। তিনি গিয়া দেখিলেন প্রস্তাবিত খালপথের মাঝে দাঁড়াইয়া আছে কুলেব্রা পাহাড়। খাল কাটিতে হইলে এই পাহাড়কে দ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে। আর এক বিষম অন্তরায় চাগ্রেস্ পার্ব্বত্য নদী।

তিনি সকল দিক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার পরিকল্পিত খালপথ আটলান্টিক উপকূলস্থ কোলোন (Colon) বন্দর হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার পর উগ্র চাগ্রেস্ নদীর উপত্যকা দিয়া ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণীর মাথায় মাথায় গিয়া সমুদ্রে পড়িবে। এই পরিকল্পনায় তাঁহার একটি মস্ত ভুল হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে দুই মহাসাগরের মধ্যস্থ ভূ-খণ্ড সাগরদ্বয়ের সমতলে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; তাহার উপর বর্ষাকালে পার্ব্বত্যনদীর রূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে এবং পথ হইতে পাহাড় কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়াও সহজসাধ্য ছিল না।

তাঁহার হিসাব মত এই কাজ সম্পন্ন করিতে প্রায় ত্রিশ কোটী মুদ্রা ব্যয় হইবে এবং আট বৎসর সময় লাগিবে। পরিকল্পনা বিজ্ঞাপিত হইবা মাত্র টাকা উঠিয়া গেল। তাঁহার পটুতায় জনসাধারণের এতদূর বিশ্বাস ছিল যে সহস্র সহস্র দুঃখী পরিবার তাহাদিগের আজন্ম সঞ্চিত অর্থ উহাতে নিয়োজিত করিতে দ্বিধা বোধ করিল না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পূর্ণোৎসাহে কাজ আরম্ভ হইল। কাগজে লেখা পরিকল্পনা যতখানি সহজসাধ্য মনে হইতেছিল প্রকৃত কাজে নামিয়া দেখা গেল—কল্পনা ও বাস্তবে আকাশপাতাল তফাৎ। সুয়েজ ও পানামা ভূ-খণ্ড একরূপ ধরিয়া যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহার প্রতিপদে গরমিল দেখা দিল।

মিশরের শুষ্ক মরুভূমিতে ম্যালেরিয়ার বালাই ছিল না। এস্থানে বদ্ধ জলাতে এক প্রকার মশা জন্মায়, তাহার দংশনে পীতজ্বর (Yellow fever) নামে এক প্রকার মারাত্মক ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। এই মশার কামড়ে রীতিমত মড়ক দেখা দিল। রোজগারের আশায় মজুরের দল আসে, কিন্তু আর ফিরিয়া যায় না ; ফলে, ক্রমশঃ মজুর দুষ্প্রাপ্য হইল।

যে নদীটীকে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সহজেই বাঁধিতে পারিবেন, উহাকে বাঁধা সহজ হইল না। যে পর্ব্বতকে কাটিয়া পথ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কাজে নামিয়া উহা দুঃসাধ্য বোধ হইল।

ত্রিশকোটী টাকা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার প্রতি লোকের বিশ্বাস অগাধ। টাকা চাহিবামাত্র আরও প্রায় ৫০ কোটী টাকা তিনি পাইলেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁহার বিরূপ। অর্থের অপব্যয় হইতে লাগিল ; কোটী কোটী টাকা চুরি ও অপব্যয় হইল। কোম্পানী পৃথিবীর চোর ও জুয়াচোরের একটি আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া ১৮৯৯ খৃঃ কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন। সহস্র সহস্র পরিবার নিঃসম্বল হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিতে লাগিল।

দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন এবং বহুলাঞ্ছনা ভোগের পরে বৃদ্ধ বয়সে কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হইল।

আর একটি নূতন কোম্পানী নূতন উৎসাহে এই কাজে নামিয়া পূর্ব্বগামী কোম্পানীর মত হার মানিয়া কাজ বন্ধ করিল। এ কাজ বোধ হয় কোন দিনই সম্পন্ন হইত না, কিন্তু দুইটী অভাবনীয় কারণে এই কাজে পুনরায় হাত পড়িল।

১। ম্যালেরিয়ার কারণ ও উপায়

স্যার রোনাল্ড রস্ (Sir Ronald Ross) আবিষ্কার করেন যে মানুষের ম্যালেরিয়া রোগ এক জাতীয় মশকের দংশনে হয়। সেই জাতীয় মশক জলায় গাছপালার আশ্রয়ে ডিম পাড়ে। এই ডিম নষ্ট করিতে পারিলে নূতন

মশা আর জন্মিবে না এবং পুরাতন মশাগুলি আয়ু ভোগ করিয়া মরিয়া গেলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস পাইবে। কুইনিন্ ম্যালেরিয়ার যম বলিলেও চলে। দরজা জানালায় তারের জালি ব্যবহার করিলে জলার মশা ঘরে ঢুকিয়া কামড়াইতে পারিবে না এবং রাত্রে শুইবার সময় মশারি ব্যবহার করিলে মশক দংশন করিবার কোন সুযোগ পাইবে না।

২। পানামা বিদ্রোহ

একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ঐ কাজে হাত দেওয়া সম্ভবপর ছিল। যুক্তরাষ্ট্র খালপথের উভয় পার্শ্বে পাঁচ মাইল ব্যাপী ভূমিখণ্ড কিনিতে পাইলে তবেই কাজে নামিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। খালের উভয় পার্শ্বের জমির উপর সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার না থাকিলে রোগ দমন করিতে পারা যাইবে না এবং মজুরদিগকে স্বাস্থ্যবিধি পালন করিতে বাধ্য করিতে পারা যাইবে না, এই কারণে তাঁহারা ঐ ভূ-খণ্ড কয়েকটি সর্ত্তে কিনিতে চাহিলেন। তখন পানামা কোলোম্বিয়ার অধীন একটি জেলা মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রবল প্রতিবেশীকে পানামার মধ্য দিয়া আংশিক স্বাধীন ভূখণ্ড ভোগ করিতে দিলে উহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে ভাবিয়া কোলোম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সর্ত্তে রাজী হইল না। কর্ত্তাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া গেল। ঠিক এই মুহূর্ত্তে পানামা বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। যুক্তরাষ্ট্র সুযোগ বুঝিয়া পানামাকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করিয়া লইয়া খালপথের ভূখণ্ড নিজ সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিয়া লইল। পুনরায় ১৯০৩ খৃঃ কাজ আরম্ভ হইল।

যুক্তরাষ্ট্র কাজে নামিয়া প্রথমেই স্থানটি হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য মশক বংশ উচ্ছেদে মনোনিবেশ করিল। জলায় কেরোসিন ছড়াইয়া দিলে উহা জলের উপর ভাসিতে থাকে। মশককীট জলের উপর একটি নলের সাহায্যে নিশ্বাস গ্রহণ করে। জলে তৈল পড়ায় বেচারারা বায়ুর অভাবে

নিশ্বাস লইতে না পারায় মারা পড়ে। এইরূপে মশক বংশ অঙ্কুরেই বিনাশের ব্যবস্থা হইল।

স্বাস্থ্যরক্ষার নানা ব্যবস্থায় মশকবংশ উচ্ছেদ করিয়া পীতজ্বর হইতে মজুরদিগের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করিয়া তাহারা প্রকৃত কাজে মন দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুই মহাসাগরের ব্যবধান সাগর পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮৫ ফুট উচ্চ। এক সাগর হইতে আর এক সাগরে যাইতে হইলে হয় ৮৫ ফুট উঠিতে হইবে, কিংবা ৮৫ ফুট নামিতে হইবে। এই খালপথের কতকাংশে লৌহ-দ্বারের (Lockgate) সাহায্যে হাজার ফুট দীর্ঘ তিনটি চৌবাচ্চা করা হইল *।

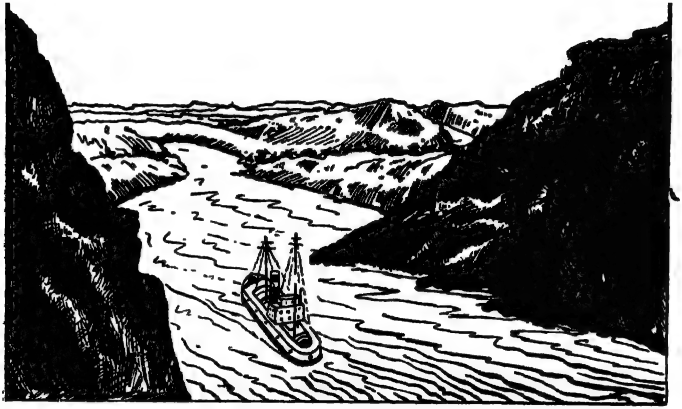

এইরূপ চৌবাচ্চা করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা ৪৫ ফুট গভীর এবং আট মাইল দীর্ঘ একটি খাত খুঁড়িয়া চারিদিকে পর্ব্বত বেষ্টিত এক উপত্যকাভূমিকে জলময় করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা হ্রদের মত এক বৃহৎ হ্রদের সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর উল্লিখিত লৌহ-দ্বারের সাহায্যে ধাপে ধাপে জাহাজ তুলিবার

"অদ্ভুত কথা" দেখ, পৃঃ ৯৮

ও নামাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এইজন্য পানামা খাল না বলিয়া পানামা সেতু বলিলেই ভাল হয়।

তাহার পর কুলেব্রা পাহাড়ের কতকাংশ কাটিয়া ফেলিয়া কারিগরেরা খালের পথ করিলেন। ৪৮ কোটি টন পাথরের টুকরা ও মাটি কাটিয়া খালের পথ করিতে কোদালি ও গাঁইতি.চালাইয়া এইরূপ বিশাল কাজ করা অসম্ভব। এইরূপ স্থলেই কলের কোদালির প্রয়োজন। পানামা খাল কাটিতে ৯৮টি কলের কোদালি ব্যবহার হয়। ইহারা এক এক কোপে ৫।১০ টন্ মাটি ও পাথরের টুকরা চাঁচিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া দিত। অবশ্য পূর্ব্বেই ডিনামাইট বা অন্য কোন বিস্ফোরক পদার্থ দিয়া পাহাড় ফাটাইয়া লওয়া হইত।

যুক্তরাষ্ট্রের এই খালটি করিতে ১০ বৎসর লাগে এবং ব্যয় পড়ে শত কোটী মুদ্রারও অধিক।

ক্যারিবিন (Cariabean) সমুদ্র হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এই খালপথটি প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ। ইহার প্রস্থ তিন শত ফুট হইতে সহস্র ফুট পর্য্যন্ত এবং ইহা গড়ে ৪৫ ফুট গভীর। এই খালপথে এক সাগর হইতে আর এক সাগরে যাইতে জাহাজের ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগে।

১৯১৪ খৃঃ ১৫ই জুন ইহার কার্য্য শেষ হইল, কিন্তু মাঝে মাঝে পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকায় ১৯১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত খালটি ঠিক রীতিমত চালু হয় নাই। ইহার পর আর কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই এবং খালপথটি আজ পর্য্যন্ত পরিষ্কার রাখিতে পারা গিয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জুন খালটি জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

পানামা খালের নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে উহার সম্পর্কে একটী মোটামুটি ধারণা জন্মিবে:

১। লম্বা ৫০ মাইল; গড়ে ৪৫ ফুট গভীর এবং ৩০০ ফুট হইতে ১০০০ ফুট পর্য্যন্ত চওড়া।

২। গটুম বাঁধ (Gatum), বাঁধের শীর্ষদেশ দৈর্ঘ্যে ৮০০০ ফুট ও প্রস্থে ২১০০ ফুট ; হ্রদের জল হইতে বাঁধের মাথা ৩০ ফুট উচ্চ।

৩। কুলেব্রা পাহাড়, ৯ মাইল কাটিতে হইয়াছে।

৪। জাহাজ তুলিবার ও নামাইবার চৌবাচ্ছা :—

(ক) গটুম লক (Gatum Locks)। গটুম হ্রদে তিনটি তুলিবার জন্য ও পাশা পাশি তিনটী নামাইবার জন্য ; চৌবাচ্ছাগুলি হাজার ফুট লম্বা।

(খ) পেড্রো মিগুয়েল (Pedro Miguel Lock)। ঐরূপ একপ্রস্থ (set) উঠিবার ও নামিবার জন্য।

(গ) মিরা ফ্লোর্স লক (Mira Flores Lock)। ঐরূপ দুই প্রস্থ উঠিবার ও নামিবার জন্য। ১১০০ ফুট চওড়া।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে খালের গণ্ডিস্থ ভূ-খণ্ডের পরিমাণ ৪৩৬ বর্গ মাইল। এবং খালের উভয় পার্শ্বের ভূমি ১০ মাইল বিস্তৃত।

(৬) জাহাজের পার হইতে সময় লাগে ৭।৮ ঘণ্টা ; ইহার মধ্যে চৌবাচ্ছাগুলি পার হইতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

(৭) ব্যয় ৩৭৫, ০০০, ০০০, ডলার (১ ডলার = প্রায় ৩ টাকা)।

(৮) ৪০, ০০০ মজুর নিযুক্ত হইয়াছিল।

আমষ্টারডাম্ হইতে ১১ মাইল দূরে বৃহৎ হারলেম হ্রদটীকে প্রথমে উহারা ছাঁচিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিল। এইকাজ করিবার জন্য উহারা তিনটী ইঞ্জিন লাগাইল। এই ইঞ্জিনগুলি দিনে দশ লক্ষ টন্ জল ছাঁচিয়া ফেলিতে পারে; চারিবৎসরে এইরূপে হ্রদ্ হইতে জল তুলিয়া খালপথে সমুদ্রে লইয়া গিয়া অগভীর বিশাল হ্রদটী শুষ্ক করিয়া চাষের উপযুক্ত করা হইল। এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়ায় উহারা জুইডার-জীর উপসাগরটি ছাঁচিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমুদ্র হল্যাণ্ডের নিম্নভূমিখণ্ড ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া ফেলায় এই অগভীর বিশাল উপসাগরটীর সৃষ্টি হয়। ইহার ক্ষেত্রফল প্রায় ১২০০ বর্গ মাইল। উত্তর সাগরের (North Sea) সহিত সংযোগের মুখে পূর্ব্বের ভূ-খণ্ডের কয়েকটী উচ্চ অংশ এখনও ডোবে নাই বলিয়া কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দ্বীপগুলির মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণ নালাপথে সমুদ্রের জল জোয়ার ভাঁটার সময় এই উপসাগরে আনাগোনা করে।

এই সঙ্কীর্ণ নালাপথগুলিতে বাঁধ দিয়া সমুদ্রের সংযোগ ছিন্ন করিতে পারিলে উপসাগরটী এক বিশাল হ্রদে পরিণত হইবে। তখন জল ছাঁচিয়া ফেলিলে শুষ্ক ভূমিতে চাষ আবাদ চলিবে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বাঁধ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। দ্বীপগুলির মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড বাঁধগুলি মিলিয়া একটী ১৯ মাইল দীর্ঘ বিশাল বাঁধ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হওয়ায় সমুদ্রের জল জোয়ারের সময় আর উপসাগরে প্রবেশ করিতে পারে না। উহার জল ছেঁচিয়া কয়েকটী খালপথে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া মোটে ৮২০ বর্গমাইল ভূ-খণ্ড সমুদ্রের গ্রাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। জুইডার-জীর মধ্যাংশ অপেক্ষাকৃত গভীর হওয়ায় প্রায় ৪০০ বর্গমাইল একটি হ্রদ চারিপার্শ্বের ক্ষেতের জল জমিবার জলাশয়রূপে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে যেস্থানে কেবলমাত্র নোনা মাছের চাষ হইত, মানুষ পুরুষকার বলে সেইস্থানে সোনার ফসল ফলাইতেছে।

ভাগ্য যাহা একদিন কাড়িয়া লইয়াছিল, মানুষ পুরুষকার বলে তাহা এতদিনে ফিরিয়া পাইয়াছে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে হৃত-ভূখণ্ড হল্যাণ্ডবাসী কিছুতেই ফিরিয়া পাইত না।

সুন্দর-বনের নিম্ন ভূমিগুলিতে এইরূপ বাঁধ দিয়া সমুদ্রের মুখ হইতে ভূ-খণ্ড উদ্ধার করিয়া চাষ আবাদ করিবার চেষ্টা নিত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

“ব” দ্বীপের ভূমি বড়ই উর্ব্বরা হয়। নোনা জলের আনাগোনা বন্ধ করিতে পারিলেই ঐ ভূ-খণ্ডে সোনার ফসল ফলাইতে পারা যায়। এই ভূ-খণ্ডের চারিদিকে বাঁধ দিয়া জোয়ারের মুখে পলিমাটিপূর্ণ নদীর জল খালপথে এই বাঁধ বেষ্টিত ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। আবার ভাঁটার মুখে ঐ জল বাহির করিয়া দিলে পরিত্যক্ত পলিমাটি মাটিতে বসিয়া উক্ত ভূ-খণ্ডকে ক্রমাগত উন্নত করিতে থাকে। কিছুদিন পরে এই প্রকারে ঐরূপ নিম্নদেশগুলি উচ্চ ভূ-খণ্ডে পরিণত করিতে পারা যায়। তখন সমুদ্রের নোনা জল জোয়ারের মুখে উক্ত জমিতে প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট করিতে পারে না।

বন্ধুরতা (Friction)

বন্ধুরতা ও মসৃণতা

বন্ধুরতা প্রতি দ্রব্যেরই আছে। দ্রব্যের অসমতলতাই বন্ধুরতা। অতি মসৃণ দ্রব্যও অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে অসমতল বলিয়া বোঝা যায়। বন্ধুরতা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেই আমরা উহাকে সাধারণতঃ মসৃণ বলিয়া থাকি।

বন্ধুরতা শাঁখের করাতের মত যাইতে আসিতে কাটে। অতএব বন্ধুরতা বন্ধু ও শত্রু উভয়ভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। কারিগরের বাহাদুরি প্রতি দ্রব্যের বন্ধুরতাকে কোথাও উচ্ছেদ করিয়া নিজের পথ সুগম করা, আবার কোথাও উহাকে কাজে লাগাইয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

সক্রীয় ও নিষ্ক্রীয় বন্ধুরতা

পথের বন্ধুরতা দ্রুতগতির এক মহা অন্তরায়। এস্থলে বন্ধুরতার শত্রুভাব। পথের এই বন্ধুরতা জয় করিবার জন্য মানুষ চাকা উদ্ভাবন করিয়াছে। যাহা চলে এবং যাহার উপর দিয়া উহা চলে, এই উভয় পক্ষের মসৃণতার উপর চলার গতি নির্ভর করে। এই উভয় পক্ষের বন্ধুর বা অসমতল পৃষ্ঠদেশের ঘর্ষণ জনিত বাধার ফলে চলার গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। যাহা চলে উহাকে সক্রীয় (Active) পক্ষ বলিলে, যাহার উপর দিয়া উহা চলে উহাকে নিষ্ক্রীয় (Passive) পক্ষ বলা চলে।

সক্রীয় পক্ষের বন্ধুরতা কতকাংশে মানুষ চাকা উদ্ভাবন করিয়া জয় করিল। নিষ্ক্রীয় পক্ষের বাধা অতিক্রম করিতে মানুষ সমতল পথ নির্ম্মাণ করিল।

চাকার জন্ম

পূর্ব্বে মানুষ মাল টানিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইত। পথের বন্ধুরতা মালের প্রতি অংশে বাধা জন্মাইয়া উহাকে সহজে অগ্রসর হইতে দিত না; ফলে মানুষের অধিকাংশ শক্তি পথের এই বন্ধুরতা জাত বাধা অতিক্রম করিতে ব্যয় হইত, গতিবেগ অল্পই হইত। মানুষ দেখিল গোলাকার বস্তু গড়াইয়া লইয়া গেলে অল্প শক্তি প্রয়োগে অধিক গতি লাভ করে। এই আবিষ্কার হইতে চাকার জন্ম।

গাড়ীর জন্ম

দুইটি চাকার উপরে মাল বহন করিবার আধারটি আঁটিয়া দেওয়ায় গাড়ী জন্মিল। গাড়ীতে মাল বহন করিবার সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ভারী মাল বহন করিতে গিয়া উহার চাকা নরম মাটিতে বসিয়া যাইত। মাটির পথ সেইজন্য ইটের বা পাথরের টুকরা দিয়া শক্ত করা হইল; ইহাতে পথের বাধা কতক কমিল।

রেল পথের উৎপত্তি

এতদিন অল্প মাল বহন করিবার জন্য হাল্‌কা কাঠের গাড়ী ব্যবহার করা হইত। ক্রমশঃ, শস্যাদির আদান প্রদান বৃদ্ধির জন্য গাড়ীগুলি বড় করিতে হইল। দুইটি চাকার মধ্যস্থলের অক্ষদণ্ডটি লোহার করা হইল এবং কাঠের চাকা দুইটিকে শক্ত করিবার জন্য একটি লোহার বেড় দেওয়া হইল। এইরূপে গাড়ীকে ক্রমশঃ স্থায়ী ও দৃঢ় করিতে গিয়া ভারী করিয়া ফেলা হইল। ভারী গাড়ীর অধিক মাল বহন করিয়া লইয়া যাতায়াত করায় ইট বা পাথর বাঁধান পথও বেশীদিন টিকিত না, এবং ক্রমশঃ পথ ভাঙ্গিয়া গিয়া অসমতল হওয়ায় পথ ও গাড়ীর মধ্যে ঘর্ষণ জনিত বাধা বাড়িয়া উঠিল।

এই নূতন বাধা অতিক্রম করিবার জন্য কারিগর রেল লাইন পাতিয়া ভারী গাড়ী চলিবার পথ করিল। লোহার মসৃণ চাকা লোহার মসৃণ লাইনের উপর দিয়া ছুটিয়া চলে। পথের বাধা জয় করিবার জন্য অধিক শক্তি ক্ষয় করিতে হয় না, অধিকাংশ শক্তি গাড়ী টানায় ব্যবহার করায় গাড়ীর গতি বাড়িয়া চলিল।

বন্ধুরতার মিত্রভাব

বন্ধুরতা থাকিলে গতি কমে, আবার উহা না থাকিলে আর এক বিপদ উপস্থিত হয়। পিচ্ছিল পথে বন্ধুরতার অভাব বলিয়া আমরা চলিতে পারি না, পড়িয়া যাই। এই জন্য উপযুক্ত বন্ধুরতার অভাবে বরফের উপর চলা দায়।

বন্ধুর পৃষ্ঠে তৈল মাখাইলে উহার বন্ধুরতা কমে, সেইজন্য তৈলাক্ত মেঝের উপর পা পড়িলে মানুষ পিছলাইয়া পড়িয়া যায়। গাড়ীর চাকার সহিত অক্ষদণ্ডের বন্ধুরতা কমাইবার জন্য এবং ঘর্ষণ জনিত তাপ বাড়িয়া যাহাতে অনর্থ না ঘটে তাহার জন্য গাড়ীর চাকা ও অক্ষদণ্ডের মাঝে চর্ব্বি বা রেড়ির তেলের মত গাঢ় ও পিচ্ছিল তেল ব্যবহার করা হয়।

পথ ও রথের মাঝে বন্ধুরতা আছে বলিয়াই আমরা ব্রেক কসিয়া সাইকেল, মোটর ইত্যাদি যান থামাইতে পারি। এ স্থলে বন্ধুরতা আমাদের বিশেষ মিত্রের কাজ করে। বন্ধুরতা না থাকিলে আমরা কোন জিনিষই বাঁধিতে পারিতাম না। ইহা না থাকিলে কাঁটা পোতা সম্ভব হইত না, কাঠের বন্ধুরতা কাঁটাকে পিছলাইতে দেয় না বলিয়া কাঁটা মারিয়া দুইখানি কাঠ জুড়িতে পারা যায়।

একটি পাথরের বড় টুকরা বা কাঠের গুঁড়ি টানিয়া লইয়া যাইতে হইলে বহু আয়াসের প্রয়োজন হয়। উহাকে দুইটি চাকার উপর বসাইয়া টানিলে অতি অল্প আয়াসেই টানিয়া লইয়া যাইতে পারা যায়। আবার চাকা দুইটি যদি মসৃণ রেল পথে চলে, তাহা হইলে উহাকে লইয়া যাইতে আরও অল্প আয়াসের প্রয়োজন হয়। চাকায় তৈল দিয়া উহার সহিত অক্ষদণ্ডের সংঘর্ষণ জনিত বন্ধুরতা কমাইলে অতি অল্প আয়াসেই কার্য্যোদ্ধার হয়। শক্তি প্রয়োগ করিলেই কার্য্যোদ্ধার হয় না, উহা কৌশলে প্রয়োগ করিলে তখন অল্প শক্তি প্রয়োগেই অধিক কার্য্য পাওয়া যায়। এই কৌশলে শক্তি প্রয়োগই কারিগরের বাহাদুরি।

কঠিন পিচ্ছিল বরফের সমতল ক্ষেত্রে মানুষ অতি দ্রুত ছুটিতে পারে। এইরূপ ছুটিবার সময় মানুষের পায়ের তলায় বিশেষ একপ্রকার লৌহ জুতা বাঁধা থাকে। অবশ্য এইরূপ ভাবে ছুটিয়া চলা অভ্যাস সাপেক্ষ। মধ্য ও উত্তর ইউরোপের লোকেরা বাল্যকাল হইতে ইহা অভ্যাস করে। শীতকালে যখন সারাদেশ বরফে ঢাকিয়া যায়, তখন এইরূপ জুতা পায়ে বাঁধিয়া ছুটা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ছেলেরা এইরূপ জুতা পরিয়া টাল সামলাইতে সামলাইতে ছুটিয়া স্কুলে যায়, পিওন পত্রাদি বিলি করিবার সময় এইরূপ করিয়াই ছুটাছুটি করে। বরফের উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিবার চেষ্টা করিলে আছাড় খাইতে হইবে; টাল সামলাইয়া ঐরূপে ছুটিতে পারিলে বরং আছাড় খাইবার সম্ভাবনা কম।

বরফের দেশে বন্ধুরতা অত্যন্ত কম বলিয়া গাড়ীর তলার চাকা ব্যবহার করিতে হয় না। একটি বড় বাক্সকে দুইটি চাকার উপর বসাইলে সাধারণ গাড়ী হয়,

চাকা দুইটি খুলিয়া লইলে ঐ বাক্সটি বরফের দেশের পিচ্ছিল পথে টানিতে মোটেই কষ্ট হয় না। বন্ধুর পথে বন্ধুরতা কমাইবার জন্য চাকা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, অতি পিচ্ছিল বরফের দেশে সেই চাকা খুলিয়া ফেলিতে হয়। বন্ধুরতা না থাকিলে আবার অগ্রগতি অসম্ভব, অবিরাম চাকা পিছলাইতে থাকিলে গাড়ী ছুটিবে কি করিয়া? এস্থলে বন্ধুরতা আমাদের মিত্র।

জলীয় বা বায়বীয় মাধ্যমের বন্ধুরতা

রথ যখন কঠিন পথে চলে, তখন বন্ধুরতাজাত বিরুদ্ধ শক্তি রথের গতিবেগের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত বাড়ে বা কমে না। কিন্তু রথ যখন জল বা বায়ু পথে ছুটে, তখন পথের বন্ধুরতা রথের গতিবেগ বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে থাকে। এই বাধা কাটাইবার জন্যই জাহাজ বা বিমানের সম্মুখ দিক এমন কৌশলে নিৰ্ম্মিত হয় যে উহা জল বা বায়ু কাটিয়া ছুটিতে পারে।

জাহাজ যখন জল কাটিয়া ছুটিতে থাকে তখন তাহার গতিবেগ বৃদ্ধির সহিত জলের বাধা বাড়িতে থাকে। এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য জলযানের অগ্র ও শেষ ভাগ সরু ও মধ্যভাগ মোটা করিয়া গড়া হয়। এইরূপ গড়নের ফলে জলযান জল কাটিয়া সহজে ছুটিতে পারে। মাটির উপরে যখন রেল গাড়ী বেগে ছুটিতে থাকে, তখন গাড়ীর বেগ বৃদ্ধির সহিত বায়ুর বাধা বাড়িতে থাকে। সেইজন্য গাড়ীতে বসিয়া মুখে ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগে।

বন্ধুরতা ও যানের গঠন কৌশল

আজকাল জার্ম্মাণীতে রেল গাড়ীর গতি বৃদ্ধির ফলে, রেলগাড়ীর সম্মুখ ও পিছনের অংশ সরু করিয়া ঐরূপ বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত হইতেছে। এইরূপ কৌশলে নির্ম্মিত গাড়ীগুলিকে (Streamlined) ষ্ট্রীম্‌-লাইণ্ড্‌ বলে।

বিমানের গতি ঘণ্টায় তিন চারিশত মাইল। ফলে বিমানকে অসম্ভব বায়ুর চাপ ঠেলিয়া ছুটিতে হয়। ঘণ্টায় ৭০।৮০ মাইল বেগে ঝড় বহিলে জনপদের

কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। একবার এই ঝড়ের মুখে ঢাকার প্রায় সকল বাড়ীরই টিনের ছাদ উড়িয়া গিয়াছিল। এইরূপ ঝড়ের মুখে পড়িলে প্রায় জাহাজ ডুবিয়া যায়। তিন চারিশত মাইল বেগে ঝড় বহিলে জীব জন্তুর কি দুর্দ্দশা হইবে বুঝিতেই পারিতেছ। বিমানকে এইরূপ ঝড়ের বেগ কাটাইয়া চলিতে হয় এইজন্য বিমানের গঠন অদ্ভুত ধরণের। যে কোন দ্রুতগতি রথের সম্মুখ ও পিছনের ভাগের গঠন কৌশল নিম্নের চিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে ভাল বুঝিতে পারিবে।

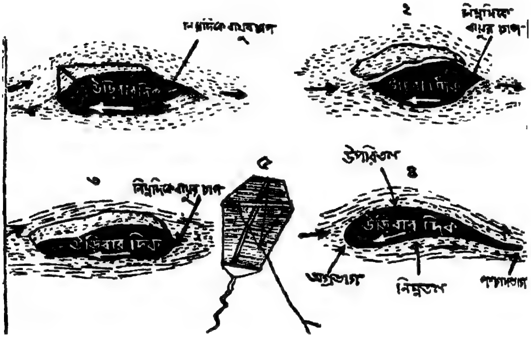
নিম্নদিকে বায়ুর চাপ
১
উড়িবার দিক
২
নিম্নদিকে বায়ুর চাপ
উড়িবার দিক
৩
নিম্নদিকে বায়ুর চাপ
উড়িবার দিক
৫
উপরিতল
৪
উড়িবার দিক
অগ্রভাগ
নিম্নতল
পশ্চাদভাগ

প্রথম চিত্র : মুখ ও পিছনের অংশ চতুষ্কোণ ; এইরূপ একটি দ্রব্য ছুটিতেছে মনে কর। উহার মুখের আয়তন অধিক হওয়ায় ঝড়ের ঝাপটা মারিবার স্থানও অধিক, ফলে বায়ুর অধিক চাপ ঠেলিয়া উহাকে অগ্রসর হইতে হয়। ছুটন্ত রথের মুখে লাগিয়া অগ্রের বায়ুরাশি দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং একভাগ উপর দিয়া যায় ও অন্যভাগ রথের তলদেশ দিয়া ছুটিতে থাকে।

দ্বিতীয় চিত্র : রথের মুখ সরু ও পিছন মোটা। ঝড়ের ঝাপ্‌টা রথের মুখে বেশী চাপিয়া ধরিতে পারে না। পূর্ব্বের মত দ্বিধা-বিভক্ত বায়ুরাশির উপরের ভাগ রথটিকে নীচে ঠেলিতে থাকে, কিন্তু রথের গঠনের দোষে নীচের বায়ুরাশি উহাকে উপরে ধরিয়া তুলিতে পারে না।

তৃতীয় চিত্র : এইরূপ গঠনে ঐ দোষ কতকাংশে সারিতে পারা গিয়াছে।

চতুর্থ চিত্র : বায়ু বা জলের মধ্যে দিয়া ছুটিবার পক্ষে এই গঠন অনুকূল। দ্বিধা-বিভক্ত বায়ুরাশির উপরের ভাগ রথটিকে নীচের দিকে বেশী চাপ দিতে পারে না, অথচ উহার নিম্নভাগ উপরদিকে উঠিবার মুখে রথের পেটে আঘাত করিতে থাকায় উহাকে নীচে পড়িতে দেয় না। মানুষ এই গঠন পারিপাট্য লাভ করিবার পূর্ব্বে বহু ভুল করিয়াছে এবং বহু আক্কেল সেলামিও দিয়াছে। মাছের ও পাখীর আকার এই আকারের মত। কে জানে কত লাঞ্ছনার পর উহারা এই আকার লাভ করিয়াছে!

বন্ধুরতা ও আসক্তি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বন্ধুরতা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মিত্র। অতি মসৃণ কাগজে লিখিতে গেলে কলম পিছলাইয়া গিয়া লেখা চলে না এবং কালি দাঁড়াইতে পায় না বলিয়া লেখা ফুটে না। একবার গাড়ী চলিলে বন্ধুরতার অভাবে উহাকে আর থামাইতে পারা যাইবে না, কারণ গাড়ীর ব্রেক মসৃণ ধরাপৃষ্ঠ ধরিতে না পারায় কার্য্যকর হইবে না। বন্ধুরতার অভাবে সুতা বা দড়ি পাকান চলিবে না, কাপড় পরা চলিবে না। গাড়ী প্রথম চালান অসম্ভব, চাকা ক্রমাগত পিছলাইতে থাকায় ঘুরিতে থাকিবে বটে কিন্তু গাড়ী অগ্রসর হইবে না। বন্ধুরতার অভাবে চলা, বলা, খাওয়া, বসা, দাঁড়ান ইত্যাদি কোন কাজই সম্ভব নহে। এক কথায় আমাদের জীবনযাত্রা অসম্ভব। আসক্তির (Cohesion) বশে পাশাপাশি পড়িয়া থাকিলেও কোন আঁট বা বন্ধন থাকিবে না। বন্ধুরতাই বন্ধনের মূল কারণ। বন্ধুরতা না থাকিলে আসক্তি শক্তিহীন।

গতির ধর্ম্ম

কোন বস্তু যদি কোন প্রকারে একবার গতি লাভ করে তাহা হইলে কোন বিপরীত শক্তি অন্তরায় না হইলে উহা সোজা পথে চলিতেই থাকিবে, ইহাই

হইল সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের বিপরীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ ক্ষেত্রের বন্ধুরতা এবং মাধ্যাকর্ষণ। ধর, একটি বল গড়াইয়া দিলে; বলটি কিছুদূর গিয়া থামিবে। আদিতে বলটি যে বেগে ছুটিতেছিল, ঐ বেগেই উহা অবিরাম ছুটিতে থাকিত; কিন্তু কতকগুলি বিপরীত শক্তি উহার ক্রমাগত অন্তরায় হওয়ায় উহার বেগ মন্দীভূত হইতে হইতে উহা শেষে নিশ্চলতা লাভ করিয়াছে; বিপরীত শক্তিগুলির মধ্যে প্রথম ভূমির বন্ধুরতা, দ্বিতীয় সম্মুখস্থ বায়ুমণ্ডলের বাধা, তৃতীয়তঃ মাধ্যাকর্ষণ। বলটিকে ভূমির বন্ধুরতা ও আকাশের বায়ু ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হয়; তাহার উপর মাধ্যাকর্ষণ বলটিকে ভূ-কেন্দ্রের দিকে অবিরাম টানিতেছে। বেচারা বলটি তোমার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু এই তিনটী বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুঝিতে গিয়া উহাকে হার মানিয়া থামিতে হইল। এই শক্তিগুলি অন্তরায় না হইলে বলটি অবিরাম ছুটিতে পারিত।

পিরামিড

মানুষের কালজয়ী কীর্ত্তিগুলির মধ্যে পিরামিডের আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পিরামিডগুলির মধ্যে মিশরপতি খুফুস্ (Khufus) নির্ম্মিত পিরামিডটি আকারে ও পরিকল্পনায় বিশালতম।

প্রাচীন মিশরবাসিগণের বিশ্বাস

মিশরপতি খুফুস্ খৃষ্ট জন্মের ৪৭০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া মিশর শাসন করেন। সেকালে মিশরবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন যে মানুষের মৃত্যুর পরেও উহার আত্মা বাঁচিয়া থাকে, এবং বাঁচিয়া থাকা কালীন অভ্যস্ত জীবন অনুসারে পারলৌকিক জীবন ভোগ করে।

এই বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁহারা মৃতদেহ হইতে পচনশীল নাড়ীভুঁড়িগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া দেহটিতে নানা ঔষধি লেপন করিতেন এবং উহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া কাঠের শবাধারে রাখিয়া উহার মুখ আঁটিয়া দিতেন। তাহার পর ঐ কাঠের শবাধারটি আর একটি পাথরের শবাধারে রাখিতেন।

মিশরপতিগণ নিজেদের জীবদ্দশায় নিজ নিজ প্রস্তর শবাধারটি রাখিবার জন্য এক একটি বিশাল পিরামিড নির্ম্মাণ করিতেন। দেহান্তে তাঁহাদিগের অনুগামিগণ ঐরূপ নির্ম্মিত পিরামিডের গোপন কক্ষস্থিত পাথরের শবাধারে তাঁহাদের মৃতদেহগুলি রাখিয়া দিতেন এবং তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় ব্যবহৃত খাট তৈজস পত্রাদি, পোষাক, রত্নালঙ্কার ও অস্ত্রাদি মহার্ঘ বস্তুগুলি সেই ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন। তাহার পর উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিবার গুপ্তদ্বার বন্ধ করিয়া দিতেন। ঐ ঘরে যাইবার গুপ্তপথ মৃতের দুটি পাচটি অন্তরঙ্গ ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিত না। তাঁহার ব্যবহৃত মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইবার ভয়ে এইরূপ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত।

মিশরবাসিগণ মিশরপতিকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেন। সেইজন্য প্রতি শক্তিশালী সম্রাটের পিরামিডের পূর্ব্বদিকে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত মৃত নরপতির মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনান্তে পূজার ব্যবস্থা করা হইত।

বর্ত্তমান মিশরের কায়রো নগর হইতে ১০ মাইল দূরে গিঝে (Gizeh) বলিয়া একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের অপর দিকে প্রস্থে প্রায় ১ মাইল একটী অতি ক্ষুদ্র মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মরুভূমিতেই প্রাচীন মিশরের সকল পিরামিডগুলি অবস্থিত। এইরূপ ক্ষুদ্রস্থানে এতগুলি কালজয়ী প্রাচীন কীর্ত্তির সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

খুফুসের পিরামিডের বিবরণ

খুফুসের পিরামিডটির সর্ব্বনিম্নতলের ক্ষেত্রফল প্রায় ৪০ বিঘা। চতুষ্কোণ তলটির প্রতি বাহুটি ৭৬৪ ফুট দীর্ঘ। ইহার উচ্চতা পূর্ব্বে ছিল ৪৮০ ফুট, এখন

মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে ৪৫০ ফুট মাত্র। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই পিরামিডটি নির্ম্মাণ করিতে ৭০মণ ওজনের ২৩ লক্ষ পাথরের টুকরা লাগিয়াছিল। সেকালে বর্ত্তমানের মত সূক্ষ্ম মাপিবার যন্ত্র ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পিরামিডটির সর্ব্বনিম্ন চতুষ্কোণ তলের দীর্ঘাকার বাহুগুলি একালের সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়া অতি সাবধানে মাপিয়াও দুই আঙ্গুলের অধিক ত্রুটি পাওয়া যায় নাই।

এই বিশাল রাজকীয় স্মৃতিপ্রাসাদগুলি নীলনদের এক তীরে অবস্থিত এবং দেখা যায় অপর তীরভূমির খনিগুলি হইতে প্রয়োজনীয় পাথর কাটিয়া আনা হইয়াছিল।

যাঁহারা পিরামিডগুলি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা এমন কোন নিদর্শন রাখিয়া যান নাই, যাহা হইতে তাঁহাদের নির্ম্মাণ বিবরণ কিছু জানিতে পারা যায়। তবে গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) কর্ত্তৃক বহুপরে সংগৃহীত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে নীল নদে বন্যা আসিলে বৎসরের ঐ তিন মাসে বড় বড় ভেলায় করিয়া অপর পার হইতে কাটা পাথরের টুকরাগুলি আনা হইত এবং এই ৭০-মণী পাথরগুলিকে নদীবক্ষ হইতে পিরামিডের পাদদেশে গড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি ক্রমশঃ-উচ্চ ঢালু পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। গাঁথা পিরামিডের উচ্চতা অনুযায়ী এই ঢালু পথটি পিরামিডকে বেড়িয়া বেড়িয়া ক্রমশঃ উচ্চ করা হইত।

এই পথটি নির্ম্মাণ করিতে নাকি দশ বৎসর লাগিয়াছিল। বৎসরের তিন মাস বন্যাঋতুতে এক লক্ষ লোক পাথরগুলি কেবল গড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। এই একলক্ষ মজুর ব্যতীত ৩৫০০ হইতে ৪০০০ রাজমিস্ত্রী এই পাথরগুলিকে গাঁথিবার জন্য বার মাস নিযুক্ত থাকিত। উহারা বিশ বৎসর ধরিয়া অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া খুফুসের আত্মার বাসস্থানের জন্য এই কালজয়ী বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে।

পিরামিডের একটি পাথরের সহিত আর একটি পাথরের জোড় দেখিলে এখনও আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই পাথরগুলি মসলা দিয়া এত পরিষ্কার করিয়া পরস্পরের সহিত জোড়া হইয়াছিল যে, মনে হয় একখানি পাথর। পূর্ব্বে পিরামিডগুলির বহিরাংশ মসৃণ ছিল; পরে লোকেরা নিজেদের বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য কতক কতক পাথর খুলিয়া লওয়ায় এখন ধাপে ধাপে পিরামিডের চূড়ায় সহজেই উঠা যায়।

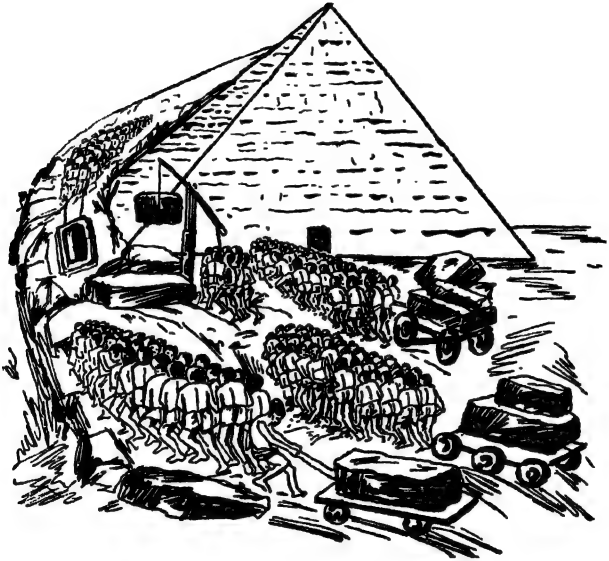

পিরামিড বেড়িয়া ঢালু পথে পাথর উঠান হইতেছে

এই বিশাল পিরামিডগুলির মধ্যস্থিত কতকগুলি কক্ষ ও পথ ব্যতীত ঐগুলি আগাগোড়া নিরেট (solid)। পিরামিডগুলি প্রায় ছয় হাজার বৎসরের পুরান। কিন্তু এতদিন ধরিয়া মরুভূমির তীব্র বালির ঝাপটায় উহার কিছুই ক্ষতি করিতে পারে নাই। উহারা আজিও নির্ম্মম মরুবক্ষে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া কারিগরের

অমর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এ বিষয়ে একালের কারিগরকে সেকালের কারিগরের নিকট হার মানিতে হয়।

পিরামিডের রাজকক্ষ

পিরামিডের কেন্দ্রস্থল খুঁড়িয়া ভূ-গর্ভে একটি কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে রাজার শবাধারটি রাখিবার ব্যবস্থা হইত। উত্তর দিক হইতে এই লুক্কায়িত কক্ষে আসিবার গোপন পথ রাখা হইত। এই রাজকক্ষটি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত হইত যে কয়েকজন অন্তরঙ্গ ব্যতীত অপর কেহ হাজার চেষ্টা করিলেও ঐ কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত না। সেকালে মিশরাধিপতিগণ অতি শক্তিশালী হইতেন এবং বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা জীবদ্দশায় যে সকল রত্নসম্ভার ব্যবহার করিতেন সেগুলিও এই কক্ষে রাখিয়া দেওয়া হইত, সেইজন্য এরূপ সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। এই সতর্কতার ফলে অনেকগুলি পিরামিডের রাজকক্ষ এখনও অলুণ্ঠিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তৎকালীন রাজকুলের অভ্যন্ত জীবনের পরিচয় আজ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

খুফুসের স্মৃতি প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ রাজকক্ষে যাইতে হইলে তিনশত ফুট দীর্ঘ পথে ভূ-গর্ভে নামিয়া একটি কক্ষে উপস্থিত হইবার পর খানিকটা উপরে উঠিলে তবে এই রাজকক্ষের ক্ষুদ্র দ্বারে পৌছান যায়। রাজকক্ষের উপরে পাঁচটি তলা নিম্মিত হইয়াছে। এইগুলির কোনটি রাণীর জন্য আবার কোনটি আর কোন প্রিয় জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই ঘরগুলির মেঝে, সিলিং ও প্রাচীর নানা বর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময়।

এ পর্য্যন্ত কারিগরের কীর্ত্তিগুলির মধ্যে কি পরিকল্পনার বিশালতায়, কি প্রাচীনতায়, কি কারিগুরি কৌশলের নিপুণতায় বা কালের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টায়, খুফুসের পিরামিডটিই যে শ্রেষ্ঠতম সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই।

১৩

চলন্ত সোপান

আজকাল ঘন বসতিপূর্ণ নগরীর ৮০।৯০ ফুট নিম্নে ভূগর্ভে ট্রেণের ব্যবস্থা হওয়ায় যাত্রীদিগের উঠানামা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ সিঁড়ি দিয়া ৮০।৯০ ফুট প্রত্যহ উঠা নামা করা শিশু, নারী, রোগী বা বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব নহে। লিফ্‌টে উঠা নামা করা কয়েক জনের পক্ষে সম্ভব কিন্তু সকলের পক্ষে উহাতে প্রয়োজনের সময় স্থান পাওয়া অসম্ভব। উহা তত নিরাপদ নহে।

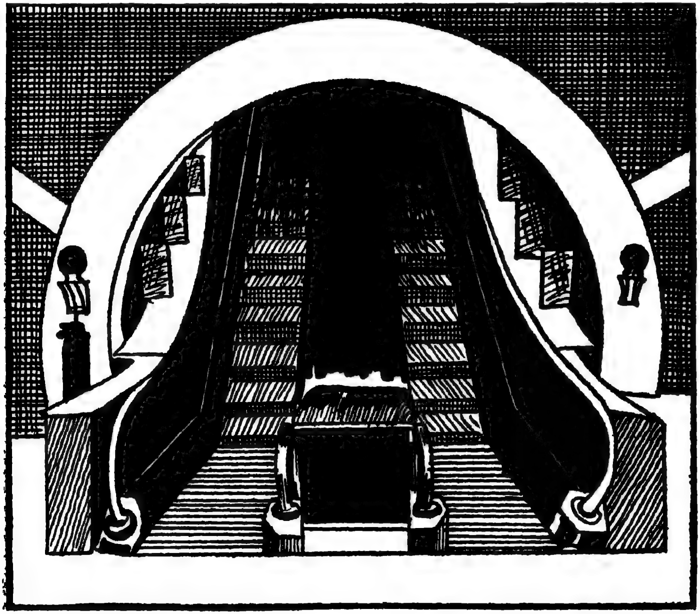

চলন্ত সোপান

কারিগর সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য চলন্ত সোপানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সিঁড়ির কোন পাদপীঠে দাঁড়াইয়া থাকিলেই হইল। উহা শক্তিশালী মোটরের সাহায্যে চলিতে থাকে। ভূগর্ভের রেল (Tube Railway)—প্লাটফরম্ হইতে উপরে আসিতে হইলে ঊর্দ্ধগতি সোপানে পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এইরূপে প্রতি পাদপীঠে যাত্রী দাঁড়াইয়া থাকিলেই কিছুক্ষণ পরে অভীষ্ট স্থানে গিয়া উঠিবে। নামিবার সময় কোন নিম্নগতি সোপানে পা দিয়া দাঁড়াইতে হয়। চলন্ত সিঁড়িগুলি এত নিরাপদ যে কখনও দুর্ঘটনা ঘটে না। প্রচুর আলোর ব্যবস্থা থাকায় সকল সময়েই দিন বলিয়া ভ্রম হয়।

লণ্ডন নগরীর ভূগর্ভের ট্রেণগুলিতে দৈনিক বিশ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করে, চলন্ত সিঁড়ি উদ্ভাবিত না হইলে সকল যাত্রীর পক্ষে ঐরূপ পথে যাতায়াত করা সম্ভবপর হইত না। চলন্ত সিঁড়ির ব্যবস্থা হওয়ায় যাত্রীগণ জানিতেই পারে না যে তাহারা উঠা নামা করিতেছে।

১৪

কলে কাপড় কাচা

ময়লা কাপড় এখন ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রায় কলেই কাচা হয়। পূর্ব্বে সোডা ও সাবান গোলা জলে কাপড় সিদ্ধ করা হইত। এখনও আমাদের দেশে ধোপারা তাই করে। জল ফুরাইয়া গেলে জল দিতে হয়, তাহা না হইলে কাপড় পুড়িয়া যাইবে। একটু অসাবধান হইলেই কাপড় পুড়িয়া যায়, এ আমাদের দেশের নিত্য ব্যাপার।

তাহার পর নদী বা জলাশয়ে গিয়া তক্তায় বা পাথরে ঐ সিদ্ধ কাপড় আছড়াইয়া ময়লা ছাড়াইয়া ধুইয়া ফেলা হয়। কাপড় আছড়াইলে বড় ছিঁড়িয়া

যায়। যে ধোপার শরীরে যত জোর, সে তত কাপড় ছিঁড়িয়া আনে আমাদের দেশে। সেইজন্য দুর্ব্বল বাঙ্গালী ধোপার অপেক্ষা সবল হিন্দুস্থানী ধোপারা কাপড় ছিঁড়িয়া আনে বেশী।

আছড়াইবার পর ভাল করিয়া ধুইয়া গায়ের জোরে কাপড় নিংড়াইয়া জল বাহির করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর নীল ও মাড় গোলা জলে পুনরায় ভিজাইয়া নিংড়াইয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। অবশেষে শুষ্ক কাপড় ইস্ত্রি করা হয়।

এখন কারিগর বুদ্ধির বলে এই সেকালের প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। এখন বড় বড় ধোপার কারখানায় নিম্নলিখিত প্রথায় সাধারণতঃ কাপড় কাচা হয়।

কাপড়গুলি প্রথমতঃ ধুতি, সাড়ী, সার্ট, পাঞ্জাবী, গেঞ্জী, তোয়ালে ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করিয়া এক একটি তারের খাঁচায় ভরিয়া দেওয়া হয়। একটি বড় লোহার পিপাতে প্রয়োজন মত জল, সাবান ও সোডা গোলা হয়। এই পিপাটি অতি বেগে ঘুরাইবার ব্যবস্থা আছে। তাহার পর ধুতি, গেঞ্জী, পূর্ণ তারের খাঁচাগুলি পিপার ঐ মসলার জলে ব্রাকেটে টাঙ্গাইয়া দিয়া পিপাটিকে অতি বেগে ঘুরান হয় এবং নিকটস্থ বয়লার (জল গরম করিবার পাত্র) হইতে আনীত নল দিয়া অতি তপ্ত বাষ্প ঐ ঘুর্ণায়মান পিপার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গরম মসলার জলে ধুলি ও তেল আদি ময়লা গুলিয়া যায় এবং পিপাটি অত্যন্ত জোরে ঘুরিতে থাকায় তপ্ত জলের ঝাপ্‌টা অত্যন্ত জোরে খাঁচাগুলির কাপড়ে গিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই উপায়ে কাপড় আছড়াইয়া কাচিবার অপেক্ষা ভাল কাজ হয়, অথচ কাপড় কম ছিঁড়ে। এই পিপার জল অত্যন্ত ময়লা হইয়া গেলে উহা বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় পরিষ্কার জল দিবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপে কাপড় কাচা হইয়া গেলে ঘন ঘন জল পরিবর্ত্তন করিয়া কাচা কাপড় ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলা হয়।

তাহার পর ঐ কাপড়গুলি হাতে না নিংড়াইয়া কলে নিংড়াইবার এক অতি সহজ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। কোন পাত্র জোরে ঘুরিতে থাকিলে কেন্দ্র-বিমুখী শক্তি (Centrifugal) বলে এই পাত্রস্থ বস্তু পাত্র হইতে ছিটকাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে থাকে ; এই প্রাকৃতিক নিয়মের সুযোগ লইয়া কারিগর কাপড় নিংড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

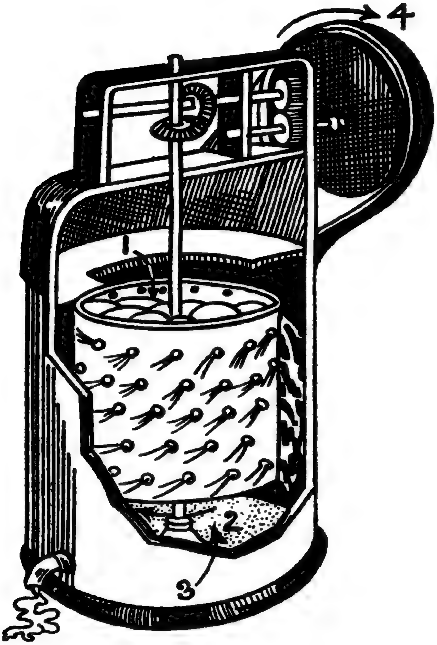

কাপড় নিংড়াইবার ব্যবস্থা

একটি বড় পিপার মধ্যে আর একটি সহস্র ছিদ্র ছোট পিপা অতি বেগে ঘুরাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। কাচা কাপড়গুলি ছোট পিপার মধ্যে রাখিয়া

উহাকে অত্যন্ত জোরে ঘুরান হয়। এই অতি ঘূর্ণিবেগের ফলে কাপড় ও কাপড়ের জলকণাগুলি ছিটকাইয়া পড়িতে চায়। কাপড়গুলি ছোট পিপার মধ্যে বদ্ধ থাকায় ছিটকাইয়া পড়িতে পায় না, কিন্তু উহার জলকণাগুলি পিপার অসংখ্য ছিদ্রমুখে বেগে বাহির হইয়া বড় পিপাতে গিয়া পড়ে। তাহার পর উহার তলদেশস্থ একটি নল দিয়া ঐ জল বাহির হইয়া যায়। এইরূপে আজকাল অতি সুন্দরভাবে কলে কাপড় কাচা ও নিংড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থায় কাপড় ছিঁড়ে না, মিহি কাপড়ের সুতা সরিয়া যায় না এবং কাচিবার ও নিংড়াইবার সময় ধোপা নির্মমভাবে নিজের গায়ের জোর দেখাইবার সুযোগ না পাওয়ায় কাপড়ের আয়ু বাড়ে।

১৫

রেল ইঞ্জিনের জন্মকথা

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে খনি হইতে কয়লা বহন করিয়া আনিবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করা যাইত। বন্ধুর পথে দেখা গেল ঘোড়া অল্প পরিমাণ কয়লাই টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য পথের বন্ধুরতা কমাইবার উদ্দেশ্যে দুটি সমান্তর লাইন কাঠের তক্তা পাতিয়া উহার উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিবার ব্যবস্থা করিয়া দেখা গেল যে ঘোড়া অধিক পরিমাণে মাল দ্রুতগতি টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দেও এইরূপ চওড়া কাঠ পাতা পথে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া ডারহাম ও নরদাম্ল্যাণ্ডের খনিগুলি হইতে কয়লা নিকটস্থ নদীর ধারে আনিবার ব্যবস্থা করা হইত।

ক্রমশঃ দেখা গেল ভারী গাড়ীগুলির চাকার চাপে তক্তাপথ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তক্তার উপর লোহার পাত মুড়িয়া

দেওয়া হইল। ইহাতে পথ দৃঢ় ও স্থায়ী হইল বটে, কিন্তু গাড়ীর চাকা চলিতে চলিতে লোহার পাত মোড়া পিচ্ছিল পথ ছাড়িয়া কাঁচা পথে নামিয়া পড়িত। ইহাতে বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন ঠিক পথে গাড়ীর চাকা রাখিবার জন্য খাঁজ করা পথ করা হইল। এইরূপে পথের নানা অসুবিধা দূর করিতে গিয়া বর্ত্তমান লোহার রেল পাতা পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান রেলপথের আদি আবিষ্কর্ত্তা উইলিয়ম জেসপ্ (William Jessop)।

বর্ত্তমানে ভারী রেলগাড়ী অতি দ্রুত ছুটিবার জন্য যে রেলপথ পাতা হয় উহার প্রতিগজ রেলের ওজন একমণেরও অধিক। বিলাতে এই পথে ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে গাড়ী নিরাপদে ছুটিতে পারে।

এইরূপে পথের বন্ধুরতা বহুলাংশে দূর হওয়ায় গাড়ীর গতি বাড়িল ও ঘোড়ার মাল বহন করিবার শক্তিও বাড়িল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই গভীর খাত হইতে কয়লা তুলিবার জন্য বা জল ছেঁচিয়া ফেলিবার জন্য বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছিল, কিন্তু এই নবলব্ধ বাষ্পীয় শক্তিকে অশ্বের পরিবর্ত্তে গাড়ী টানাইবার চেষ্টা তখনও সফল হয় নাই।

এই অভিনব চেষ্টায় প্রথম সফলকাম হন কুগনট্ (Cugnot) নামে একজন ফরাসী। এত বড় আবিষ্কারের ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার নির্ম্মিত ইঞ্জিন পথে ছুটিতে ছুটিতে একটি প্রাচীরে ধাক্কা লাগে; প্রাচীরটি পড়িয়া যায়, ইঞ্জিনটির বাষ্পাধার (boiler) ফাটিয়া যায় এবং কতকগুলি লোক আঘাতে মারা পড়ে। ফলে কুগনট্ গেলেন কারাগারে এবং তাঁহার অদ্ভুত যন্ত্রটি গুদামে তালা বন্ধ হইল। ইহাকেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা!

তাহার পর রিচ্যার্ড ট্রেভিথিক (Richard Trevithick) নামে এক ব্যক্তি কর্ণ্ওয়ালে (Cornwall) একটি কার্য্যকর ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন এবং উহা লণ্ডনে লইয়া গিয়া চালান। এক্ষেত্রেও ভাগ্যের প্রতিকূলতায় লণ্ডনবাসিগণ এইরূপ অভিনব আবিষ্কারে কোনরূপ উৎসাহ বা কৌতূহল দেখাইল না।

দৈবের বিধানে আর একজন বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগ আবিষ্কারের জন্য

চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন। তাঁহার নাম জর্জ্জ ষ্টিফেন্সন্ (George Stephenson); একজন দরিদ্র কয়লা খনির কুলির সন্তান তিনি। শৈশবে তিনি পলাইয়া বেড়াইতেন। পিতার দারিদ্র্যের জন্য শৈশবে কিছু লেখা পড়াও শিখিতে পারেন নাই। সেকালে ধনী ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে লেখাপড়া হইত না।

বাল্যকালে তিনি গরু চরাইয়া দৈনিক ছয় পয়সা রোজগার করিতেন। এ কাজও বেশী দিন রহিল না। কিছুদিন বেকার থাকিবার পর তিনি এক কয়লার খনিতে দৈনিক নয় আনা পারিশ্রমিকে চাকুরী পাইলেন। কয়লাখনির মুখে যে ইঞ্জিনের সাহায্যে কয়লা তোলা বা লোক নামান হইত, সেই ইঞ্জিনে কয়লা দিবার কাজে তিনি নিযুক্ত হইলেন।

খাটুনি অসম্ভব, কিন্তু তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এই প্রথম তিনি দেখিতে পাইলেন, কেমন করিয়া বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা কাজ করান যাইতে পারে। ক্রমশঃ তিনি আঠার বৎসর বয়সে ইঞ্জিন চালাইবার ভার পাইলেন।

এতদিনে তিনি শিক্ষার অভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি দিনে চাকুরী করিতেন এবং সন্ধ্যায় লেখাপড়া শিখিবার জন্য এক শিক্ষকের পাঠশালায় যাইতে লাগিলেন। এই সামান্য লেখা ও পড়া শিখিবার জন্য তাঁহাকে সপ্তাহে পাঁচ আনা গুরুদক্ষিণা দিতে হইত। আর এক শিক্ষক দয়া করিয়া তাঁহাকে অঙ্ক শিখাইতেন।

প্রাণপণে যত্ন ও সাধনায় কিছু দিনেই জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিল। ফলে ইঞ্জিন চালাইতে চালাইতে যে সকল ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করিলেন, সেইগুলি দূর করিয়া তিনি এক অভিনব ইঞ্জিনের পরিকল্পনা দাঁড় করাইলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে গাড়ী টানা ইঞ্জিনের তিনি এক নক্সা করিলেন। খনির মালিকেরা তাঁহাকে এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যথেষ্ট টাকা দিলেন। ইঞ্জিন গড়িবার কারিগরের অভাব, যন্ত্রের অভাব, মাল মসলার অভাবের ত কথাই নাই।

বর্ত্তমানের গ্রাম্য কামারের যন্ত্রাদি দিয়া তিনি বহু আয়াসে ও এক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় একটি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিলেন।

তাঁহার প্রথম ইঞ্জিন কার্য্যকর হইলেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আর একটি পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিলেন। নদী হইতে দূরবর্ত্তী পশ্চিম ডারহামের (Durham) খনিগুলি হইতে কাটা কয়লা নদীতে সহজে আনিবার জন্য রেলপথ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব এই সময়ে উঠিল। তিনি প্রস্তাবটি শুনিতে পাইয়া ডারলিংটনে (Darlington) উপস্থিত হইলেন এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার যিনি ভার লইয়াছিলেন তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তিনি এবিষয়ে নিজে এক নূতন প্রস্তাব উক্ত কার্য্যের কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এডওয়ার্ড পিজের (Mr. Edward Pease) নিকট উপস্থিত করায়, মিঃ পিজ্ তাঁহাকে ঐ কাজের প্রধান কারিগরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ষ্টিফেন্সন্ নিজের সঞ্চয়ের অধিকাংশ দিয়া এবং কিছু টাকা ধার করিয়া নিউকাশ্‌ল্এ (New Castle) এক কারখানা করিলেন। বলিতে গেলে, এই কারখানাই পৃথিবীর প্রথম ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা।

রেলপথ পাতা হইল। প্রথম ইঞ্জিন 'লোকোমোশন' (Locomotion) নির্ম্মিত হইল। উহার গাড়ীগুলিও নির্ম্মিত হইল। স্থির হইল ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮২৫ খৃঃ এই নূতন পথে 'লোকোমোশন' তাহার গাড়ীগুলিকে প্রথম টানিয়া লইয়া যাইবে। এই অভিনব পরীক্ষার যাঁহারা ভার লইয়াছিলেন তাঁহাদিগের এই নূতন কার্য্যের উত্তেজনায় কয়েক রাত্রি নিদ্রাই ছিল না।

'লোকোমোশনের' পিছনে এক সারি গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হইল, ষ্টিফেন্সন্ নিজের কারখানায় গড়া ইঞ্জিনে উঠিয়া উহা নিজেই চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গাড়ীগুলিতে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বহু ব্যক্তি কৌতুহল ভরে চড়িলেন। এক বিশাল জনতা মজা দেখিবার জন্য রেলপথের দুই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদিগের উল্লাস ও উৎসাহ ধ্বনিতে দিক্‌বিদিক্ পূর্ণ হইল। একজন অশ্বারোহী ইঞ্জিনের সম্মুখে লাল পতাকা হস্তে ছুটিতে থাকিবে বলিয়া প্রস্তুত হইল।

ষ্টিফেন্সন্ অশ্বারোহীকে ইঙ্গিত করিয়া গাড়ী ছাড়িলেন। ক্রমশঃ গাড়ীগুলি চলিতে চলিতে যখন ছুটিতে আরম্ভ করিল তখন সমবেত জনতা যে আনন্দধ্বনি করিল তাহার তুলনা নাই। ষ্টিফেন্সনের পরীক্ষা আজ সফল হইল।

তখন রেলপথে ঘোড়ার গাড়ীর চলন বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। উল্লিখিত ঘটনার চারি বৎসর পরে লিভারপুল ও ম্যান্‌চেষ্টারের মধ্যবর্ত্তী রেলপথের মালিকেরা গাড়ী টানিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য প্রায় আট হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। ষ্টিফেন্সন তাঁহার বিখ্যাত "রকেট" (Rocket) নামক ইঞ্জিন তৈয়ারী করিয়া এই পুরস্কার লাভ

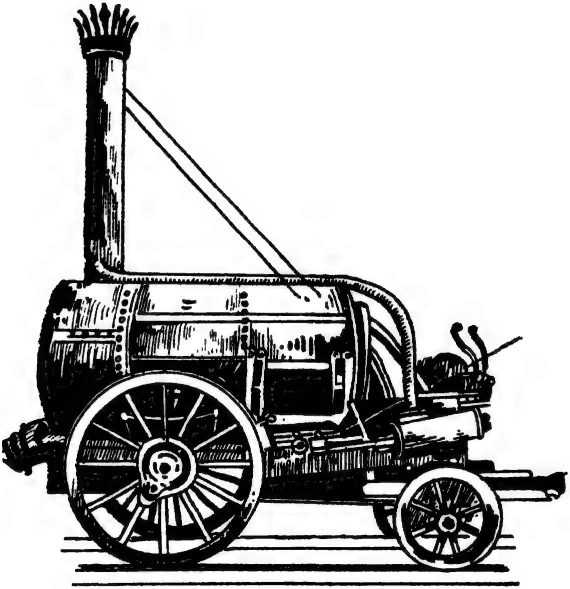

ষ্টিফেনসনের 'রকেট'

করিলেন। এই ইঞ্জিনটি তাঁহার পূর্ব্ব ইঞ্জিনগুলির এক উন্নত সংস্করণ। রেলপথের উপর দিয়া ভীষণভাবে দুলিতে দুলিতে 'রকেট' পিছনের গাড়ীগুলি লইয়া ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করিল। সে যুগে এইরূপ বেগে ছুটা একটা পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার ছিল; ইতিপূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার কেহ শোনেও নাই।

লোকের ধারণা ছিল ঐরূপ বেগে ছুটিলে গাড়ীর লোকগুলি নিশ্বাস লইতে পারিবে না এবং দম বন্ধ হইয়া মারা যাইবে। কিন্তু লোকের সাধারণ বিশ্বাসে টলিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ও বাষ্পীয় শক্তিতে অটল বিশ্বাসের জন্য জগতে দ্রুতগতি ও রেলপথের প্রবর্ত্তন হইল।

১৬

কারিগরের সেরা কীর্ত্তি

শক্তির মূলে সংযম। শৃঙ্খলিত ও সংযত করিলে শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বাষ্পীয় শক্তি শৃঙ্খলিত ও সংযত করিয়া কারিগর উহাকে অক্লান্তভাবে খাটাইতে পারে। বাষ্পীয় শক্তিকে যন্ত্রে পুরিয়া খাটাইয়া লওয়া কারিগরের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিলেই চলে। বর্ত্তমান সভ্যতা এই এক শক্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইয়োরোপে যে আজ এত দুদ্ধর্ষ তাহার কারণ—বাষ্পীয় শক্তির সাধনা।

বহুদিনই কোন কোন মনীষীর মাথায় বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাইবার কথা খেলিয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ শক্তিকে যন্ত্রে পুরিয়া খাটাইবার রীতিমত চেষ্টা প্রথম করেন জেমস্ ওয়াট্ (James Watt) অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

বাষ্পীয় যন্ত্রের মোটামুটি তিনটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম অংশ—চুল্লী, এইখানে কয়লা পুড়িয়া তাপে পরিণত হয়। ২য় অংশ—বাষ্পপাত্র, এই

স্থানে জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। ৩য় অংশ—সিলিণ্ডার, এইটির সাহায্যে শৃঙ্খলিত বাষ্পীয় শক্তি কার্য্য করে।

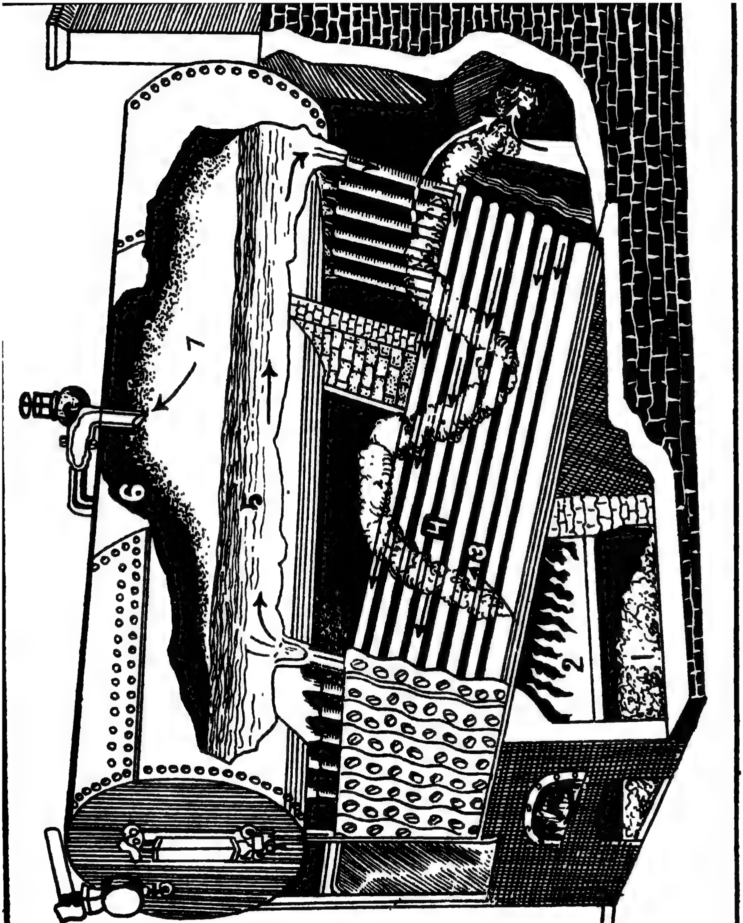

বাষ্পাধার

১ম, চুল্লী

ইহার প্রধান অংশ চতুষ্কোণ কুণ্ডে (Fire box) কয়লা জ্বলিয়া তাপ সৃষ্টি করে। এই অগ্নিকুণ্ডের তলদেশে বহু ছিদ্র থাকায় ছাই ও কয়লার ছোট টুকরাগুলি নীচে ছাই গাদায় পড়িয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। অগ্নিকুণ্ডের একটি ছোট কপাট খুলিয়া মাঝে মাঝে কয়লা দেওয়া হয়। চিত্রের ১ চিহ্নিত স্থান ছাইগাদা এবং ২ চিহ্নিত স্থান অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়া আকাশে বাহির হইয়া যাইবার জন্য একটা চিমনি থাকে।

২য়, বাষ্পপাত্র

বর্ত্তমানে ইহার অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা মুখচাপা জলের সাধারণ পাত্রই হইত। ইহাতে বাষ্পপাত্রের চারিটি পাশের মধ্যে মাত্র তলদেশে তাপ পায়। কোন প্রকারে চারিদিকেই যদি তাপ লাগিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় তাহা হইলে খুব অল্প সময়েই জল বাষ্পে পরিণত হইবে এবং সব তাপটুকুই কাজে লাগিবে। সেইজন্য বর্ত্তমানে ইহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম অংশ আংশিক জলে পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় অংশ কতকগুলি নলের সমষ্টি মাত্র। এই অংশ উপরের অংশ হইতে অগ্নিকুণ্ডের উপর ঝুলিতে থাকে। উপরের জলপাত্র হইতে জল কয়েকটি পথে নলগুলির মধ্যে নামিয়া আসে এবং বাষ্পে পরিণত হইয়া আবার কয়েকটি মুখ দিয়া জলপাত্রে প্রবেশ করিয়া জলপাত্র পূর্ণ করে। এই ব্যবস্থায় বাষ্পপাত্র সম্পূর্ণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকায় সকল দিকেই তাপ পায়। চিত্রের ৩ ও ৪ চিহ্নিত অংশ দুইটি বাষ্পপাত্রের নলগুলি অগ্নিকুণ্ডে ঝুলিতেছে। ৫ চিহ্নিত অংশটী জলপাত্র। ৬ অঙ্কিত স্থান বাষ্প এবং ৭ চিহ্নিত নল দিয়া মাঝে মাঝে শীতল জল প্রয়োজন হইলে, জলের ট্যাঙ্ক হইতে ভরিয়া লওয়া হয়। উপরে যে চিত্র দেওয়া হইল উহা স্থাণু যন্ত্রের, সেইজন্য ইঁটের গাঁথুনি দেখান হইয়াছে।

কোন কোন বাষ্পাধারেও ঐ নলগুলির মধ্য দিয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নি শিখা প্রবেশ করে এবং নলে নলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চিমনি দিয়া সধুম শিখা বাহির হইতে থাকে। এই নলগুলি জলপাত্রে ডুবিয়া থাকে, ফলে জল নলস্থ অগ্নিশিখার সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্পে পরিণত হয়।

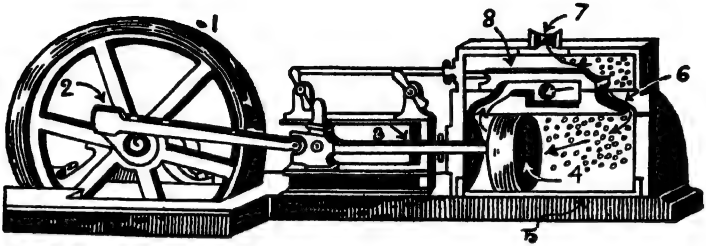

১ম চিত্র

৩য়, সিলিণ্ডার অংশ

এই অংশে বাষ্পশক্তি কারিগরের কলে পড়িয়া তাহার ইচ্ছামত খাটিতে বাধ্য হয়। ১ম চিত্রের ৭ চিহ্নিত পথে বাষ্পপাত্র হইতে বাষ্প ৮ চিহ্নিত কুঠরিতে আসিয়া প্রবেশ করে। তাহার পর ৬ চিহ্নিত মুখ খোলা পাইয়া ঐ মুখে ৫ চিহ্নিত সিলিণ্ডারের মধ্যে বেগে প্রবেশ করে। এই সিলিণ্ডারের মধ্যে ৪ চিহ্নিত একটি চাকতি এমনভাবে আঁটা আছে যে উহা বাষ্পের চাপে সিলিণ্ডারের মধ্যে আনাগোনা করিতে পারে; অথচ উহার এক পিঠের বাষ্পরাশি উহার ধার দিয়া অপর পিঠে যাইবার পথ পায় না। এই চাকতির (Piston) অপর পিঠে ৩-চিহ্নিত একটি দণ্ড সংযুক্ত আছে। বাষ্পের ঠেলায় যখন পিষ্টন্‌টি আনাগোনা করে, তখন উহা একবার সিলিণ্ডারের বাহিরে যায় এবং পুনরায়

ভিতরে প্রবেশ করে। পিষ্টন-দণ্ডটির এইরূপ আনাগোনার ফলে ১ চিহ্নিত একটি বৃহৎ চাকা (Fly Wheel) ৩ চিহ্নিত ক্র্যাঙ্কের সাহায্যে সমান বেগে ঘুরিতে থাকে। এই চাকাটির ঘূর্ণনের সহিত নানা যন্ত্র চালাইয়া কারিগর নানা কাজ আদায় করে।

প্রথমচিত্রে বাষ্প-কুঠরি হইতে বাষ্প ৬ চিহ্নিত সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিয়া পিষ্টনটিকে বাহিরের দিকে ঠেলিতে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে পিষ্টনের অগ্রগতির সহিত উহার দণ্ডটিও বাহিরে ছুটিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমান্তর দণ্ড ৮ চিহ্নিত বাষ্প কুঠরিতে বেগে প্রবেশ করে। ইহার সহিত একটি চলন্ত কপাট আঁটা আছে। এই দণ্ডটি ভিতরে প্রবেশ করিলে ঐ কপাটটি আসিয়া

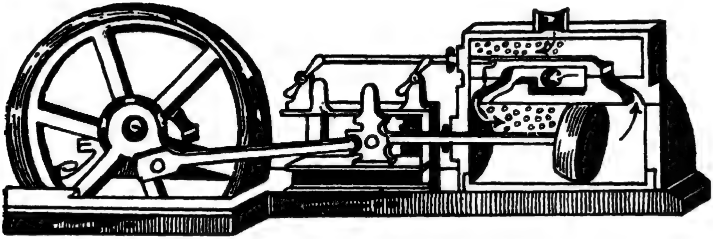

২য় চিত্র

৬ চিহ্নিত মুখটি চাপিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এই বাষ্পকুঠরি হইতে বাষ্পের সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিবার দুইটি মুখ আছে। এমন কৌশলে ঐ কপাটটি নির্ম্মিত যে ৬ চিহ্নিত মুখটি বন্ধ হইয়া গেলে অপর মুখটি খুলিয়া যায়। তখন এই মুখে বাষ্পরাশি কুঠরি হইতে সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে এবং পিষ্টনটিকে বিপরীত দিকে ঠেলিতে থাকে। ইহার ফলে পিষ্টনদণ্ডটি বেগে ভিতরে প্রবেশ

করে এবং উহার সমান্তর দণ্ডটি বেগে বাহিরে আসে। এই দণ্ডটির সহিত সংযুক্ত কপাটটি তখন সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দিকে সরিয়া আসিয়া ৬ চিহ্নিত মুখটি খুলিয়া দেয় এবং অপর মুখটি বন্ধ করে।

এইরূপে বাষ্পের সাহায্যে ক্র্যাঙ্কটিকে অগ্র পশ্চাৎ চালাইয়া একটি ফ্লাই-হুইল সমানবেগে ঘুরান হয়। ফ্লাই-হুইলের ঘূর্ণনের ফলে ক্র্যাঙ্কের রৈখিক-গতি (Lineal motion) ঘূর্ণি-গতিতে (circular motion) পরিণত হয়। ঘূর্ণি-গতি সমান তালে ও বেগে চলে বলিয়া উহার সাহায্যে ভাল কাজ পাওয়া যায়।

১৭

ভূগর্ভে রেলপথ

প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ তাহার নানা প্রয়োজনের বশে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ কাটিয়া পথ করিয়া লইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েক স্থানেও ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ পথের পরিচয় পাই। ভারতে এখনও কয়েক স্থানে প্রাচীন সুড়ঙ্গ পথের অবশিষ্টাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লী ও আগ্রা দুর্গদ্বয়ের মধ্যে যমুনার পাশে পাশে ৯০ মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ ছিল। আগ্রা দুর্গ হইতে তাজমহল পর্য্যন্ত আর একটি সুড়ঙ্গ পথের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি পথের মুখ ইংরাজ বাহাদুর গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেকালে দীর্ঘ খানা কাটিয়া উহার মেঝে, দুইপাশ ও ছাদ ইট দিয়া গাঁথিয়া সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করা হইত। তাহার পর ছাদের উপর মাটি ফেলিয়া চারিপার্শ্বের ভূমির সহিত সমতল করিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ উপায়ে কিন্তু ভূগর্ভের গভীরতর প্রদেশে সুড়ঙ্গ পথ করা সম্ভব ছিল না।

লণ্ডনে প্রথমে ভূগর্ভে রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার সময় কারিগরেরা অনুরূপ উপায়ে সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করেন। আজকাল এক নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ায় সুড়ঙ্গ পথ করা পূর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য হইয়াছে।

এই কৌশল উদ্ভাবন করেন মার্ক ইসাম্‌বাদ ব্রুনেল (Marc Isambad Brunel) নামে এক ফরাসী ওস্তাদ কারিগর। এই কৌশল অবলম্বনে তিনি বিলাতের টেম্‌স্ নদীর তলদেশে এক সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করেন এবং এক তীর হইতে অপর তীরে হাঁটিয়া যাবার পথ সুগম করেন।

৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন নগরীতে ১৫ লক্ষ লোকের বাস ছিল, আজ সেই স্থানে ৮০ লক্ষ লোকের বাস। লণ্ডনের ক্ষেত্রফল প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল। বড় বড় কারখানা আপিস, ব্যাঙ্ক, বিপণি, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি নানাবিধ বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠায় সেখানে লোকের বাস দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। দিনে লক্ষ লক্ষ লোক লণ্ডন নগরীতে কার্য্যোপলক্ষে যাতায়াত করে। পথ ও রথের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এই অসংখ্য লোকের যাতায়াত করিবার সুবিধা হইয়াছে।

পূর্ব্বে পাকা রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যাতায়াত চলিত। তাহার পর রেল পথের ব্যবস্থা হওয়ায় রেলপথে ঘোড়া গাড়ি টানিয়া ছুটিতে লাগিল। উহার পরে বাষ্পীয় শক্তি গাড়ী টানায় ব্যবহৃত হওয়ায় ঘোড়ার স্থানে ইঞ্জিনের ব্যবহার আরম্ভ হইল।

লণ্ডন জনবহুল হইবার বহু পূর্ব্বের সঙ্কীর্ণ পথগুলি দিয়া ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় লোক যাতায়াত করিতে থাকায় সময়ে সময়ে যানবাহন ও মানুষের ভিড়ের চাপে পথ রুদ্ধ হইয়া লোক চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন লোকের দৃষ্টি ভূগর্ভ পথের দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইল।

প্রথমে খানা কাটিয়া রেলপথ করা হইত ; তাহার পর খানার মাথায় ছাদ গাঁথিয়া এবং উহার উপরে মাটি চাপা দিয়া ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ পথ নির্ম্মিত হইত। এইরূপ বদ্ধ সুড়ঙ্গ পথে কিন্তু সকল সময়েই ইঞ্জিন হইতে নির্গত ধূম ও বাষ্প

মিলিয়া ঘন কুয়াসার সৃষ্টি করিত। তাহার পর বিজলী শক্তির প্রচলন হওয়ায় ভূগর্ভে যাতায়াত অতি সুখকর হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভূগর্ভে রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার জন্য সুড়ঙ্গ কাটার রীতিরও বহু উন্নতি সাধিত হওয়ায় লণ্ডনের ৯০ ফুট ভূ-নিম্নে প্রায় ৬০ মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সুড়ঙ্গ পথগুলির মধ্যে দীর্ঘতম সুড়ঙ্গটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ মাইল।

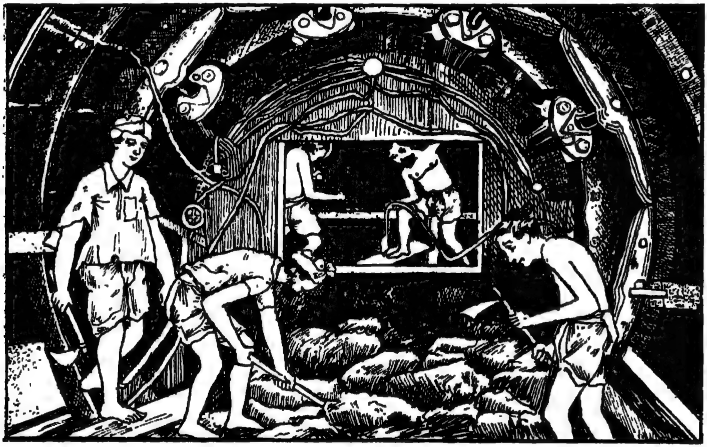

ব্রুনেল সাহেবের উদ্ভাবিত উপায়ে সুড়ঙ্গ কাটা হইতেছে

এইবারে ব্রুনেল উদ্ভাবিত কৌশলের কথা বলিব। প্রথমে খনিগর্ভে নামিবার মত একটি কূপ কাটা হয়। এইরূপ ৮০।৯০ ফুট গভীর কূপ খনন করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে ভূগর্ভে নামিবার পথ করা হয়। এই পথে লিফ্‌ট্ (Lift) সাহায্যে নামিয়া শ্রমিকেরা প্রয়োজন মত সুড়ঙ্গ কাটিতে আরম্ভ করে। যে স্থলে পূর্ব্বে

ইঁটের খিলান ও প্রাচীর গাঁথিয়া সুড়ঙ্গ স্থায়ী ও নিরাপদ করা হইত, সে স্থলে টুক্‌রা টুকরা মোটা লোহার পাতে সুড়ঙ্গ পথ মুড়িয়া দেওয়া হয়। মাপ করা টুকরা টুকরা পাতগুলি দিয়া আঁটিয়া দিলে মিলিত লোহার টুকরাগুলি একটি বৃহৎ সাধারণ লোহার নলে পরিণত হয়; প্রভেদ মাত্র এই—নলপথের নিম্নদেশ গোল না হইয়া সমতল। এই লোহার টুকরাগুলি সমান মাপে কাটা ও ছেঁদা করা। সুড়ঙ্গ সামান্য কাটা হইলেই কারিগর প্রয়োজনমত লোহার পাতগুলি একটির সহিত আর একটি জুড়িয়া দিয়া নলটী ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকেন।

এই দৃঢ় লোহার নলের মধ্যে থাকিয়া মজুরেরা মাটি কাটিয়া চলে এবং ক্রমশঃ সুড়ঙ্গ পথ দীর্ঘ হইতে থাকেন। এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান নলের ভিতর থাকিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া ব্রুনেল সাহেব সর্ব্বপ্রথম টেম্‌স্ নদীর তলদেশ দিয়া মানুষের হাঁটা পথ নির্ম্মাণ করেন।

আজকাল এই সুড়ঙ্গ কাটা লোহার নলের বহুপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। লণ্ডনের তলদেশে এঁটেল মাটি পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে লোহার নলের মুখে মাটি কাটা চক্র থাকে। এই চক্রটী অতিশয় বেগে ঘুরিয়া মাটি কাটিয়া পথ করিলে, নলটীকে যান্ত্রিক শক্তিবলে নূতন কাটা-পথে একটু ঠেলিয়া দেওয়া হয় এবং পিছনের দিকে পূর্ব্ব-বর্ণিত উপায়ে টুকরা টুকরা লোহার পাত আঁটিয়া দিয়া নলটীকে দীর্ঘ করা হয়।

এঁটেল মাটির স্তরে জল না থাকায় এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব; কিন্তু যে স্তরে বালি, কাঁকর বা পাথরের নুড়ি পাওয়া যায়, সে স্তরে মাটি কাটিতে কাটিতে হঠাৎ তোড়ে জল উঠিয়া শ্রমিকদিগের জীবন বিপন্ন হইতে পারে এবং কাটা সুড়ঙ্গ পথ জলে ভরিয়া উঠিতে পারে; সেইজন্য এইরূপ স্তরে অন্য এক কৌশল অবলম্বন করা হয়। নদীতে পুলের ভিত্তি গাঁথিবার সময় যেরূপ লৌহকূপে অধিক চাপে বায়ু পুরিয়া দিয়া নদীর জল ঢুকিতে দেওয়া হয় না, সেইরূপ সুড়ঙ্গ কাটিবার সময় নলপথে পথে অধিক চাপে বায়ু পাম্প করিবার ব্যবস্থা এইরূপ ক্ষেত্রে করা হয়।

কোথাও সুড়ঙ্গ কটিতে হইলে উভয় দিক হইতে কাটিতে আরম্ভ করা হয়। তাহার পর উভয় দিক হইতে কাটিতে কাটিতে মাঝে আসিয়া কারিগরেরা মিলিত হয়। আজকাল দিক্-নির্ণয় যন্ত্রের উন্নতি হওয়ায় ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ পথ উভয় দিক হইতে কাটিতে কাটিতে আসিলেও দিক্‌ভ্রম হয় না; ঠিক দুইটী সুড়ঙ্গ এক স্থানেই আসিয়া মিলিত হয়।

লণ্ডনের ভূগর্ভের গাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে কোন ষ্টেশনে থামিলে গাড়ীর দরজাগুলি আপনি খুলিয়া গিয়া যাত্রীদিগের উঠিবার নামিবার পথ করিয়া দেয়। দরজা খোলা বা বন্ধ করা গার্ডের গাড়ার মধ্যে স্থিত একটি সুইচের উপর নির্ভর করে।

নগরের যে স্থানে ভূগর্ভে নামিলে টিউব রেলপথের ষ্টেশন পাওয়া যাইবে, সেই স্থানের ষ্টেশন বাড়িটীর উপর একটী সন্ধানী আলোক শিখা (Searchlight) পড়িয়া যাত্রীদিগকে অন্ধকারে পথ দেখায়। যাত্রীগণ নগরীর কোন পথের ধারে এইরূপ ষ্টেশন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গন্তব্য স্থানের টিকিট কেনেন। আমাদের দেশের মত লোকে টিকিট বিক্রয় করে না। প্রতি ষ্টেশনে যাইবার টিকিট বিক্রয়ের জন্য কয়েকটী যন্ত্র দাঁড় করান আছে। সেই যন্ত্রে টাকা দিলেই গন্তব্য স্থলের টিকিট ও বাকি পয়সা ফেরত পাওয়া যায়। তাহার পর বিশাল চলন্ত সোপানে পা দিলেই কিছুক্ষণের মধ্যে এক পা না চলিয়াই টিউব ষ্টেশনে পৌছান যায়।

ষ্টেশনে কয়েক মিনিটের পর পর ট্রেণ পাওয়া যায়। প্রতি ট্রেণে তিন হইতে ছয়খানি ছোট ছোট কামরা থাকে। যেমন ষ্টেশনগুলি শুষ্ক, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল আলোক মালার বিভূষিত, গাড়ীগুলিও সেইরূপ। ধোঁয়া ও কুয়াসায় ঢাকা অন্ধকার পথ হইতে নিম্নে টিউব ষ্টেশনে নামিলেই মনে হয় যেন মুহূর্ত্তে যাদুবলে মায়াপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেখানের সকল ব্যবস্থাই যন্ত্রকৌশলের উপর নির্ভর করে। এই যন্ত্রগুলির কার্য্যকরী শক্তি দেখিলে উহাদিগকে মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়।

লণ্ডনের ভূগর্ভ রেলপথে ২০০০ গাড়ী দিনরাত্রি ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯৪টি ষ্টেশনে ১৭১ টি লিফ্‌ট ও ৮৫ টি বিশাল চলন্ত সোপান অবিরাম যাত্রীদিগকে পাতালপুরী হইতে উপরে লইয়া যাইতেছে এবং উপর হইতে পাতালপুরীতে নামাইয়া দিতেছে। এই দীর্ঘ পথ ও ষ্টেশনগুলির ১০:,০০০ বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোকে মনে হয় না যে লোকে পাতাল পুরীতে চলাফেরা করিতেছে। এই ভূগর্ভের রেলপথগুলি স্বাস্থ্যকর রাখিবার জন্য অবিরাম অশুদ্ধ বায়ুরাশি যন্ত্রে টানিয়া লইয়া বিশুদ্ধবায়ু যোগান দেওয়া হইতেছে।

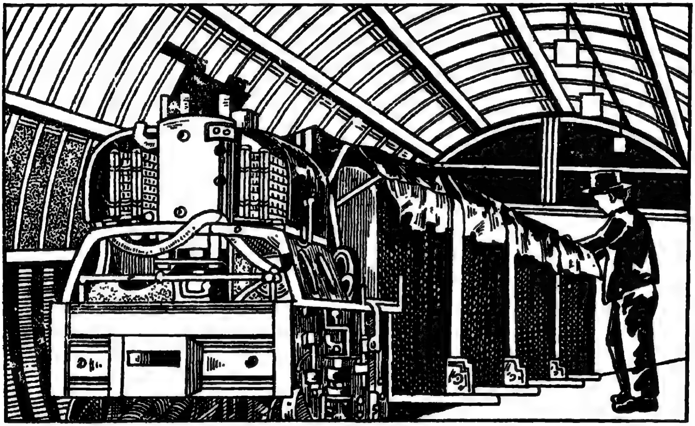

লণ্ডন জেনার‍্যাল পোষ্ট আফিসের পার্শ্বেলবাহী রথীহীন রথ

কোন খেলা ধূলা বা বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষে যখন যাত্রীর ভিড় বাড়ে তখন প্রতি দেড় মিনিট অন্তর একটি করিয়া ট্রেণ ছাড়ে। এক গোল্ডারস্ গ্রীন্ (Golders Green) নামক ষ্টেশনেই বৎসরে ১৩,০০০,০০ যাত্রী গাড়ী হইতে নামে বা গাড়ীতে উঠে।

ভূগর্ভের এই বিশাল পাতালপুরীর প্রতি কার্য্যটি করিতে বিজলী শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই বিজলী শক্তি উৎপাদন করিতে প্রতিদিন প্রায় ২২০০০ মণ কয়লা প্রয়োজন হয়।

যন্ত্র কৌশলে বলীয়ান মানুষ এখন গাড়ী চালাইবার জন্য চালকেরও প্রয়োজন অনুভব করে না। একস্থানে বসিয়া মাত্র বিজলী চাবির (Switch) সাহায্যে সে সকল স্থানের কার্য্য এখন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। গত যুদ্ধের সময় লণ্ডন জেনার‍্যাল পোষ্ট আফিস (G. P O.) হিসাব করিয়া দেখিল লণ্ডনের মধ্যে একস্থান হইতে অন্য একস্থানে কেবলমাত্র পার্শ্বেল বহনের জন্য যে মোটর ভাড়া লাগে উহা অপেক্ষা সস্তায় একটি ছোট টিউব রেলে পাঠান চলে। সেই জন্য তাঁহারা কেবল মাত্র নিজেদের পার্শ্বেল বহিবার ছোট একটি টিউব রেলপথ (Tube Railway) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার গাড়ীগুলি আরও ছোট। এই গাড়ীগুলি চালাইবার জন্য চালক নিষ্প্রয়োজন। ষ্টেশনে গাড়ীগুলিতে পার্শ্বেল পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, এবং গন্তব্য স্থানে উহা পৌছিলে উহাকে থামাইয়া লইয়া সেই ষ্টেশনের পার্শ্বেলগুলি নামাইয়া লইয়া আবার গাড়ীখানিকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় মনে হয় জড় লৌহ যেন মানুষের বুদ্ধিবলে হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়াছে।

১৮

পার্ব্বত্য রেলপথ

আজকাল কারিগর পর্ব্বতের উচ্চ শিখরেও উঠিবার জন্য রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে পথে যেরূপ কৌশলের প্রয়োজন, কারিগর সে পথে সেইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া দুর্গম পথকে সুগম করিয়া তোলেন।

সাধারণতঃ পার্ব্বত্য পথে উঠিতে হইলে, ক্রমশঃ ঢালুপথ নির্ম্মাণ করা হয়। এই পথ ধীরে ধীরে পর্ব্বত শিখরে উঠে বলিয়া মানুষ বা গাড়ীর উঠা নামা তত শক্ত নহে। কিন্তু যেস্থলে পথের খাড়াই কিছুতেই কমাইতে পারা যায় না, সেস্থলে কারিগর এক অদ্ভুত উপায়ে গাড়ী উপরে তোলেন।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রদেশে ক্যালাও-ওরোয়া (Callao-oroya) রেলপথ পাতিবার সময় প্রথম এই অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করা হয়। এইরূপ উপায়ে খাড়া পথেও ট্রেণ ১৫৮৩৫ ফুট, অর্থাৎ তিন মাইল অপেক্ষাও উচ্চে উঠিতে পারে। ছবি দেখিলে এই নূতন কৌশলের কতক ধারণা করিতে পারিবে।

রেলপথের দুইটি রেল লাইনের মাঝে এক সারি দন্তযুক্ত লাইন পাতা হয়। গাড়ীর তলদেশে মাঝখানে একটি দন্তযুক্ত চাকার (clogwheel) ব্যবস্থা থাকে। গাড়ী পার্ব্বত্য পথে উঠিবার বা নামিবার সময় গাড়ীর দন্তীচক্র (clogwheel) পথের দাঁতের সারিতে আটকাইয়া উঠা নামা করে। এই কৌশলকে Rack and pinion কৌশল বলে।

ইয়োরোপের আল্পস্ পর্ব্বতের নানা চূড়ায় উঠিবার জন্য বহু পার্ব্বত্য রেলপথে ঐরূপ কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হইলেও বড়ই নিরাপদ।

এইরূপ উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় পার্ব্বত্য পথের খাড়াই কমাইবার জন্য বহুস্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিবার বা সুড়ঙ্গ কাটিবার প্রয়োজন হয় না।

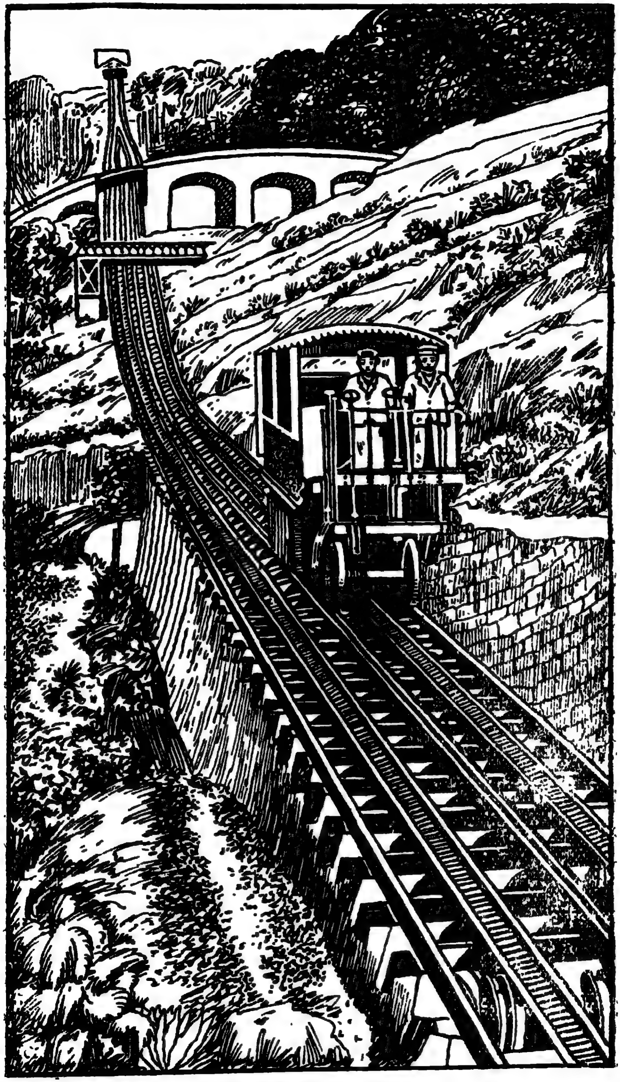

ক্যালাও-ওরোয়া রেলপথ হেনার মিগ্‌স (Henry Meiggs) নামে এক বিখ্যাত ওস্তাদ কারিগরের পরিকল্পনা। এই পথের প্রথম একশত মাইল খাড়া পথ সর্পিল গতিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীর উপর পুল গাঁথিয়া, কোথাও বা পাহাড় ভেদ করিয়া পথ করা হইয়াছে। এই পথ এত দুর্গম যে ৫০ মাইলের মধ্যে ৬০টি সুড়ঙ্গ কাটিতে হইয়াছে।

দুর্গম পর্ব্বতগাত্রে এই পথ কাটিতে মাসে ছয় হাজার মণেরও অধিক ডিনামাইট ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। এই একটি বিষয় হইতেই পথের দুর্গমতার ধারণা জন্মিবে।

পথের দুই তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই মিগ্‌স সাহেব দুশ্চিন্তা ও অর্থাভাবে মারা গেলেন। পথের তখন মাত্র ৮৮½ মাইল সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং আণ্ডিজ পর্ব্বতের মাত্র ১২,২০০ ফুট উঠিয়াছে। ওস্তাদ কারিগরের অকাল-মৃত্যুর পর কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিল।

তাহার পর আর একজন ওস্তাদ কারিগর এই কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই পথের শেষ ষ্টেশন পর্ব্বতের এত উচ্চে অবস্থিত যে সেখানে নিশ্বাস লইতে হইলে হাঁপাইতে হয়। এই স্তরের বায়ুমণ্ডল এত পাতলা যে বহু শ্রমিক কাজ করিতে গিয়া মারা পড়ে।

আর একটি বিখ্যাত রেলপথের কথা বলি শুন। দক্ষিণ অমেরিকার আরজেণ্টাইন ও চিলি প্রদেশদ্বয়ের মাঝে আণ্ডিজ পর্ব্বতমালা। এই পর্ব্বত মালার উচ্চ প্রদেশের উপর দিয়া রেলপথ লইয়া যাওয়ায় আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়ে যাতায়াত এখন মাত্র ত্রিশ ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়।

বলিভিয়ার রেলপথই পৃথিবীতে উচ্চতম প্রদেশে পাতা হইয়াছে। এই রেলপথ মাত্র আড়াই ফুট চওড়া (Narrow Gauge)। রেল পথের কতকাংশ ১৫,৮৩৪ ফুট উচ্চ প্রদেশে অবস্থিত। পেরুর রেলপথের কতকাংশ প্রায় ১৫,৮০৬ ফুট উচ্চে, উক্ত পথের পাশাপাশি গিয়াছে।

১৯

এক-খিলান পুল

"অদ্ভুত কথায়" নদীতে পুলের ভিত্তি গাঁথার কথা পড়িয়াছ। নদীগর্ভে মাঝে মাঝে থাম গাঁথিয়া এরূপ দুটি থামের ফাঁকের উপর ছোট ছোট পুল নির্ম্মাণ করিয়া বড় বড় নদীর পুল গাঁথা হয়।

আজকাল কারিগরি বিদ্যার এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে নদী জরীপ হইয়া গেলে, আফিসে বসিয়া পরিকল্পনা করিয়া কারখানায় ফেলিয়া দিলে কারিগরেরা পুলটির প্রতি অংশটি এমন নিখুঁত ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারে যে ঐগুলি অকুস্থলে লইয়া গিয়া বোল্টু আঁটিয়া দিলেই একটী সম্পূর্ণ পুলে পরিণত হয়।

এই বিদ্যার এইরূপ অসম্ভব উন্নতি হওয়ায় আজকাল নদীগর্ভে থাম না গাঁথিয়া এক-খিলান পুল নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। নদীর দুই পাড়ে সুদৃঢ় ভিত্তি গাঁথিয়া আফিসের পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানার নিখুঁতভাবে গড়া পুলের অংশগুলি দুই পাড় হইতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া লইয়া গিয়া মধ্যস্থলে মিলাইয়া দেওয়া হয়। এমন হিসাবের বাহাদুরি যে কোনও স্থানে একটু ভুল হয় না। নিম্নে কয়েকখানি ছবির সাহায্যে কারিগরের এই অদ্ভুত কারিগরির সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করা গেল। আমাদের হাওড়ার নূতন পুল এই রীতিতে নির্ম্মিত হইতেছে।

নির্ম্মাণ কৌশলে পুলের সমষ্টি ভারের অর্দ্ধাংশ প্রতি পাড়ে গিয়া পড়ে, সেইজন্য পাড়ের ভিত্তি অতিশয় দৃঢ় করিয়া গাঁথিতে হয়। তাহার পরে দুই পাড় হইতে কারখানার নির্ম্মিত পুলের অংশগুলি গাঁথা আরম্ভ হয়। লোহার টুকরাগুলিকে গাঁথিবার সময় ঠিক স্থানে তুলিয়া ধরিবার জন্য দুই পাড়ে পুলের উপরে চলন্ত দুইটী করিয়া ক্রেণ প্রথম হইতেই বসাইয়া লইতে হয়। এই

ক্রেণগুলি নদীপথে আনীত জাহাজ বা নৌকা হইতে মাপ করিয়া কাটা পুলের টুকরাগুলি ক্রমানুযায়ী ঠিক স্থানে তুলিয়া ধরে এবং কারিগরেরা ঐ গুলিকে পরস্পরের সহিত বোল্ট্ আঁটিয়া দেয়। এইরূপে পুলটি ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গরূপ গ্রহণ করে।

পুলটি গাঁথিবার সময় ক্রেণগুলি পুলের খিলানের উপর পাতা লাইনে চলা ফেরা করিতে পারে। পুলটির সঙ্গে সঙ্গে ক্রেণের লাইনটিও অগ্রসর হইতে থাকে। পুলটি গাঁথা শেষ হইলে ক্রেণগুলিকে ঐ পাতা পথে নদীর দুই পাড়ে ফিরাইয়া আনা হয় এবং তখন উহার অংশগুলি খুলিয়া ফেলিয়া স্থানান্তরিত করা হয়।

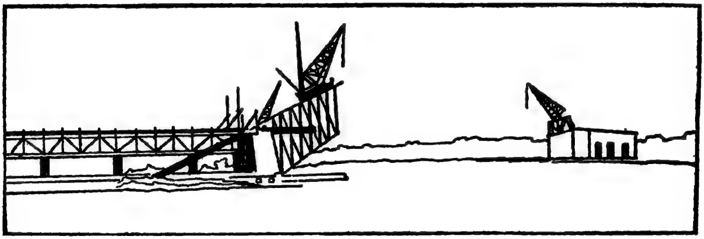

১ম চিত্র। পুলটি দুই পাড় হইতে গাঁথা আরম্ভহইতেছে

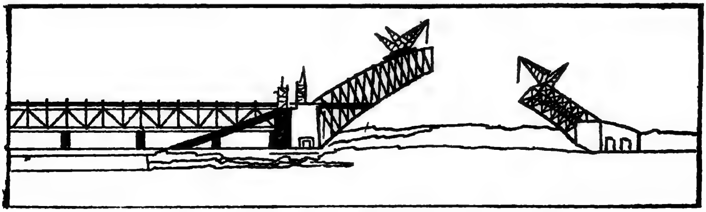

২য় চিত্র। পুলটির দুই মুখ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে

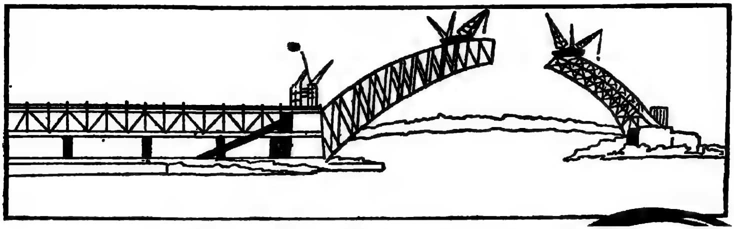

৩য় চিত্র। পুলটির দুই মুখ প্রায় মিলিয়া আসিয়াছে

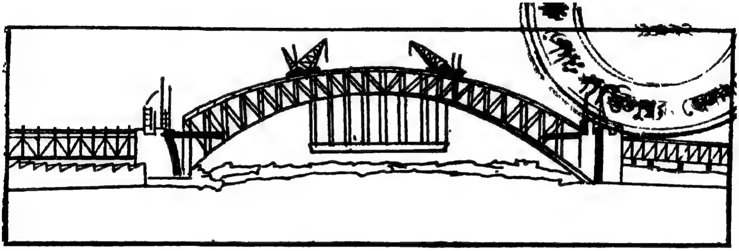

৪র্থ চিত্র। পুলের খিলান সম্পূর্ণ হওয়ায় উপর হইতে লোহার বাঁধনগুলি ঝুলাইয়া দিয়া গাঁথা হইতেছে ঃ এই বাঁধনগুলিতে পুলের পথটি ঝুলিবে

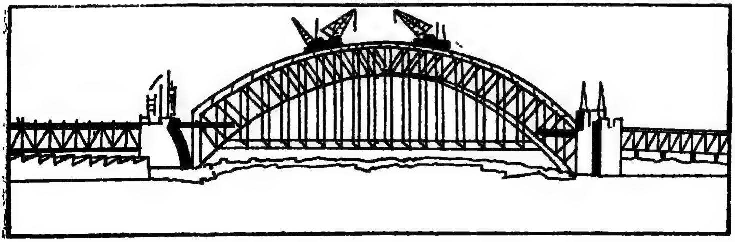

৫ম চিত্র। সর্ব্বাঙ্গ পুলটি এইবারে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে

২০

অতিকায় জাহাজের নোঙ্গর

আজকাল জাহাজগুলিও যেরূপ বিশালকায়, উহার নোঙ্গরগুলিও তদ্রূপ। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে একটি সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে যাহা ব্যয় হইত, আজকাল জাহাজের একটি নোঙ্গর নির্ম্মাণ করিতে তাহাই ব্যয় হয়।

যে অতিকায় জাহাজগুলি আটলান্টিক মহাসাগর পারাপার হয়, উহাদিগের নোঙ্গরগুলির ভার ১২ টনেরও অধিক হইয়া থাকে। এক একটি জাহাজে একাধিক নোঙ্গর থাকে। সাধারণতঃ প্রধান নোঙ্গরটির ওজন ১২ টন এবং অন্যগুলির ওজন ১০ টন হইয়া থাকে। ছোট নোঙ্গরগুলি সকল সময় ব্যবহার করা হয়। বিশেষ বিপদের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে প্রধান নোঙ্গরটি তোলা থাকে।

পূর্ব্বে কতগুলি মোটা লোহার দণ্ড সূচ্যগ্র করিয়া ও বাঁকাইয়া দিয়া নোঙ্গরের মুখ করা হইত; আজকালকার বিশাল নোঙ্গরগুলির ভারে মুখের কাঁটাগুলি ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া মুখগুলি ছাতার আকারে গড়া হয়।

এই বিষমভার নোঙ্গরগুলি জলে নামাইবার বা তুলিবার জন্য বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহার করা হয়। যে শৃঙ্খলে এইরূপ অতিকায় নোঙ্গর বাঁধা থাকে, উহার প্রতি পর্ব্বটির ওজন এক হন্দর (প্রায় ১ মণ ১৪ সের)। শৃঙ্খলটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০০ ফুট এবং ওজনে ১৩০ টন। অতিকায় নোঙ্গরের জন্য অতিকায় শৃঙ্খলের প্রয়োজন।

২১

শূন্যে দড়ি পথ

বর্ত্তমান যুগের কারখানায় যেরূপ পরিমাণে দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হয় উহার জন্য কাঁচা মাল যোগাইবার ও প্রস্তুত মাল গুদামে সরাইয়া রাখিবার জন্য যদি মজুর নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে কারখানায় লোকের ভিড়ে একটা ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

পূর্ব্বের কুটীর শিল্পের প্রথা

পূর্ব্বের ‘একাই একশ’ প্রথা আজকাল অচল। কুটীর শিল্পে একই কারিগরকে সকল কাজই করিতে হয়; এইরূপ প্রথায় কাজ ভাল হইতে পারে কিন্তু তত দ্রুত কাজ পাওয়া যায় না। ফলে মজুরি বেশী পড়িয়া যায়। ধর, কাপড় বোনা; উহা আমাদের দেশে একটি কুটীর শিল্প। তাঁতি হাট হইতে সুতা কিনিয়া আনে, সুতা ভিজায়, মাড় দিয়া শুকায়, সুতা প্রস্তুত হইলে টানা দেয়, টানা গুটাইয়া তাঁতে আঁটে, তাহার পর পোড়েনের নলি প্রস্তুত করিয়া বুনিতে বসে। এরূপ প্রথায় একা তাঁতিকে সকল কাজই করিতে হয়। ইহাতে সময়ের অপচয় হয় এবং কাজ তত পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমানের কারখানার প্রথা

আজকাল কারখানায় যে প্রথায় কাজ হয় উহাতে একজন কারিগরই কার্য্যারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই প্রকার কাজ করে। ধর, একটি মোটর গাড়ীর কারখানা। উহাতে কয়েকটি বিভাগ আছে। ইঞ্জিন নির্ম্মাণ বিভাগ, চাকা নির্ম্মাণ বিভাগ, টায়ার প্রস্তুত বিভাগ, গাড়ীর তলদেশের কাঠাম (chassis প্রস্তুত বিভাগ, গাড়ীর বডি (উপরের অংশ) প্রস্তুত বিভাগ, গাড়ী রং করা

বিভাগ, গাড়ীতে গদি আঁটা বিভাগ, ইলেক্‌ট্রিক সাজ আঁটা বিভাগ ইত্যাদি নানা বিভাগে বিশাল কারখানাটিকে ভাগ করিয়া লওয়া হয়।

দেখা গেল ইঞ্জিনটি প্রস্তুত করিতে ৫০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যোগ করিতে হয়। এই ৫০০টি অংশ যোগ করিবার জন্য ৫০০টি কারিগর নিযুক্ত হয়। একই কাজ ক্রমাগত করিতে করিতে ঐ কাজে কারিগরের এমন একটা দক্ষতা জন্মে যে সে ঐ কাজ নিখুঁত ও সুন্দর ভাবে দ্রুত সম্পন্ন করিতে পারে। এইরূপ প্রথায় কোন কারিগরের অলস হইবার উপায় নাই; কারণ ক্রমানুসারে তাহার নিকটে অন্য কারিগরের নিকট হইতে কাজ ক্রমাগত আসিতেছে এবং তাহার পরের কারিগর তাহার নিকট হইতে কাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ফলে একজনের অবহেলায় বা আলস্যের জন্য সমস্ত কারখানার কাজ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ইঞ্জিন নির্ম্মাণ বিভাগে কেহ-বা গলিত ইস্পাত ঢালিয়া ইঞ্জিনের খোল নির্ম্মাণ করিতেছে কেহ বা একটি মাত্র স্ক্রু আঁটিয়া দিতেছে। প্রতি কারিগরের জন্য একটি মাত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ইঞ্জিনটির ঢালা খোলটি ক্রমশঃ চলন্ত পাত্রে চাপিয়া ক্রমানুসারে প্রতি কারিগরের নিকট উপস্থিত হয় এবং ঐ কারিগর তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশটি উহাতে আঁটিয়া আবার ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে ইঞ্জিনটি ৫০০টি কারিগরের নিকট হইতে ৫০০টি অঙ্গ লাভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইলে উহাকে ঐ চলন্ত পাত্রে চাপাইয়া কারখানার অন্য এক বিভাগে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এইরূপে মোটর ইঞ্জিনটি কোন বিভাগে গিয়া শাসি (তলদেশের কাঠাম) লাভ করে, কোন বিভাগে গিয়া চাকাগুলি সংগ্রহ করে; আবার কোন বিভাগে গিয়া বডি সংগ্রহ করে। ধীরে ধীরে ইঞ্জিনটী নানা বিভাগ হইতে বহু কারিগরের নিকট হইতে ক্রমশঃ সকল অঙ্গ সংগ্রহ করিয়া পূর্ণাঙ্গ নূতন মোটর গাড়ীতে পরিণত হয়। অবশেষে যখন উহা সর্ব্বাঙ্গ লাভ করিয়া গুদামজাত হইল, তখন হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে অন্ততঃ পাঁচ হাজার লোকের মিলিত পরিশ্রমে গাড়ীটি প্রস্তুত হইয়াছে।

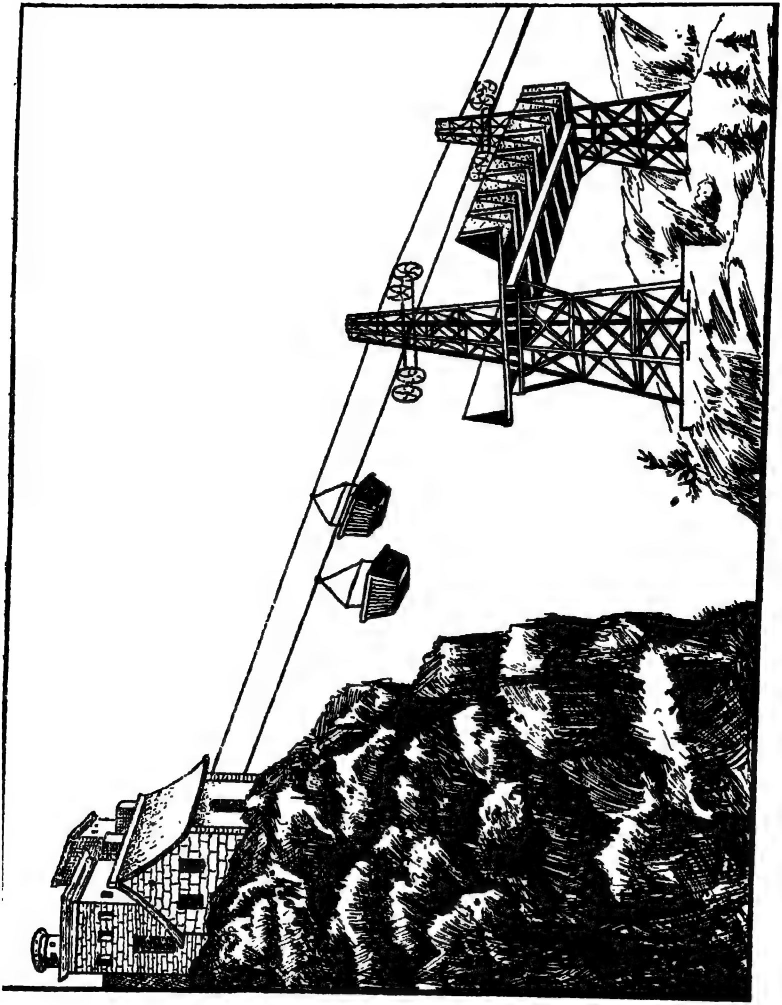

এইরূপ দুর্গম গিরিপথে দড়ি পথই প্রশস্ত

কারখানার প্রধান সমস্যা—কাঁচা মাল হইতে পূর্ণাঙ্গ মোটরগাড়ী গুদামজাত হওয়া পর্য্যন্ত উহাকে এক কারিগরের নিকট হইতে আর এক কারিগরের সম্মুখে অবিরাম নিঃশব্দে পৌছাইয়া দেওয়া। এই গুরুকার্য্যের জন্য ওস্তাদ কারিগর চলন্ত পাত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই চলন্ত পাত্র লোহার দড়িতে ঝুলিতে ঝুলিতে অবিরাম চলিতে থাকে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতি কারিগরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইস্পাতের পিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণাঙ্গ মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত উহা বোধ হয় তখন কারখানায় চলন্ত পাত্রে দশ মাইল বাহিত হইয়াছে।

এই দুরপ্রসারী বাহন-কার্য্য যদি মজুর দিয়া সম্পন্ন করা হইত তাহা হইলে কার্য্যটি এত নিঃশব্দে ও সুশৃঙ্খলায় কিছুতেই সম্পন্ন হইত না। এইরূপ প্রতি কারখানার অবিরাম কার্য্য সুলভে ও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করিতে চলন্ত পাত্রের একান্ত প্রয়োজন। এই চলন্ত পাত্রে চাপিয়া দড়িপথে ঝুলিতে ঝুলিতে কাঁচা মাল এক কারিগরের নিকট হইতে এক অঙ্গ লাভ করিয়া অন্য কারিগরের নিকট উপস্থিত হয় এবং ক্রমানুসারে সহস্র কারিগরের মোহন স্পর্শে ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গতা লাভ করিতে থাকে।

প্রতি কারখানার প্রয়োজন অনুসারে নানারূপ বাহন পত্রের উদ্ভাবন করিতে হয়। কোথাও রক্ততপ্ত অঙ্গার বহন করিতে হয়। কোথাও অতিতপ্ত গলিত লৌহ বহন করিতে হয়। কোথাও বা আবার কয়লার ধূলি বহন করিয়া লইয়া গিয়া চুল্লিতে যোগান দিতে হয়। অবিরাম যান্ত্রিক বাহন উদ্ভাবিত হওয়ায় কোন প্রকারের দ্রব্যই বহন করা আজ আর দুঃসাধ্য নহে।

দড়ি পথে গাড়ী যাতায়াত

Rack and pinion-কৌশলে নির্ম্মিত পার্ব্বত্য রেলপথ অপেক্ষা দড়িপথ অতি সুলভে নির্ম্মিত হইতে পারে। আজকাল এইরূপ সুদৃঢ় দড়িপথের এত উন্নতি হইয়াছে যে এই পথে ঝুলানো গাড়ী চালাইয়া যাত্রী যাতায়াতেরও ব্যবস্থা হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও সুইজারল্যাণ্ডের দুর্গম প্রদেশে যাতায়াত করিবার

জন্য এইরূপ দড়িপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ পথে প্রায় খাড়াখাড়ি পর্ব্বতে উঠিতে পারা যায়। কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের দেশে দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি দড়িপথে সহরের আবর্জ্জনা সুদূর নিম্ন খাড়িতে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নেপাল সরকার ভারত হইতে নিজরাজ্যে মাল বহনের জন্য দুর্গম পর্ব্বতের মাথায় দড়ি পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দড়িপথে মাল বহন করিবার জন্য একটি অখণ্ড লোহার দড়ি ব্যবহার করা হয়। ফলে দড়ির একাংশ এক পথে যায় এবং বিপরীত পথে উহার অপরাংশ ফিরিয়া আসে। এইরূপ উপায় যখন দড়ি পথে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাল যায়, ঠিক সেই সময় শেষোক্ত স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত স্থানে মাল আসিতে পারে। ইহাতে বাষ্পীয় বা বিজলী শক্তির অপচয় হয় না। একই শক্তি প্রয়োগে কতক মাল যায় এবং কতক মাল আসে। বিলাতে দুর্গম প্রদেশস্থ কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ মাল দড়িপথে দ্রুত ও সুলভে নিকটস্থ বন্দরে বিদেশে চালান দিবার জন্য আনা হয়।

২২

কারিগরের কয়েকটি বৃহত্তম, দীর্ঘতম ও উচ্চতম কীর্ত্তি

উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের (George Washington) স্মৃতিতে নির্ম্মিত শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভটি ৫৫৫ ফুট উচ্চ। ইহার চূড়ায় উঠিতে হইলে ৯০০ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। বৈদ্যুতিক লিফ্‌টেও (Lift) উঠিতে পারা যায়।

বৃহত্তম কার্পেট

আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরীতে ওয়ালডফ্-আষ্টোরিয়া (**Waldof-Astoria**) হোটেল নামে একটি বৃহৎ হোটেল আছে। ইহার বৈঠকখানায় যে কার্পেটটি পাতা আছে তাহাই পৃথিবীতে বৃহত্তম কার্পেট। উহা দৈর্ঘ্যে ৭০ ফুট ২ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৪৯ ফুট ১১ ইঞ্চি। চেকো-শ্লোভাকিয়ায় ৩০টি কারিগর ১০ মাস অবিরাম খাটিয়া এইটিকে বুনিয়া শেষ করে। কার্পেটে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাগানের নক্সা তোলা হইয়াছে। বাগানে জলের ঝরণা, খাল, ফুলগাছের কেয়ারি, রাঙ্গা পথ, সবুজ ঘাসের মাঠ, মায় ঝিলে মাছ, হাঁস, ফুটন্ত বা ফোটা পদ্ম, কিছুরই ত্রুটি ধরা পড়ে না। কার্পেটটি নাকি এত সুন্দর যে দেশ বিদেশের যাত্রী ইহা দেখিবার জন্য হোটেলে আসে।

উচ্চতম প্রাসাদ

নিউইয়র্কের এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং (Empire State Building) পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম প্রাসাদ। রাজপথ হইতে ইহার উচ্চতা ১২৮৪ ফুট,—প্রায় সিকি মাইল। প্রাসাদের মূলদেশেই (Base) ছয় তলা অবস্থিত। সর্ব্বশুদ্ধ ১০২ তলায় উঠিয়া প্রাসাদটি শেষ হইয়াছে। ৫৮০০ কারিগরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিশাল প্রাসাদটি গঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে প্রতি বৃহৎ কার্য্যে বলির প্রয়োজন হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রেও ঘটে নাই। অতি সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও পাঁচটি কারিগর এই প্রাসাদে কাজ করিবার সময় প্রাণ হারায়।

এইরূপ বিশাল প্রাসাদ গঠনে বিশেষ ধৈর্য্য ও কৌশলের প্রয়োজন। প্রাসাদটির নক্সার জন্য ওস্তাদ নক্সাজীবিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান করা হয়। বহু নক্সার মধ্যে তিন চারিটি মাত্র পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত হয়। এই কয়েকটি নক্সা (plan) অনুযায়ী কয়েকটি নমুনা-বাড়ী (model) প্রস্তুত করিয়া

মালিককে দেখান হয়। তাঁহার অভিরুচি অনুযায়ী একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করিবার ভার কোন খ্যাতনামা ঠিকাদারকে (contractor) দেওয়া হয়।

তাঁহারা প্রথমেই স্থানটি পরিষ্কার করিয়া ৩০।৩৫ ফুট গভীর করিয়া ভূগর্ভ খুঁড়িয়া ফেলেন। এত নিম্ন হইতে প্রাসাদের ভিত্তি গাঁথিয়া তোলা হয়। ইহাতে ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং প্রাসাদের ভূগর্ভের স্থানটুকু গুদাম ইত্যাদি রূপে ব্যবহার চলিতে পারে।

ইতিমধ্যে নক্সা অনুযায়ী ইস্পাতের কাঠাম প্রস্তুতের ঠিকা যে কারখানা লইয়াছিল, উহারা একে একে ইস্পাতের অংশগুলি প্রস্তুত করিরা ঐগুলিতে ক্রমিক সংখ্যা দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল। অন্য দিকে কাঠের কারখানায় মাপ অনুযায়ী জানালা, দরজা আদি প্রাসাদের কাঠের অংশগুলি তৈয়ারী হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ অকুস্থলে কংক্রীটের মাল মসলা একে একে সংগৃহীত হইল। ভিত্তি গাঁথা হইয়া গেলেই, কারখানা হইতে দিনে দিনে কাজের মত ইস্পাতের অংশগুলি আসিতে লাগিল। কারিগরেরা ঐগুলিকে নক্সা অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে আঁটিয়া দিয়া পরিকল্পিত প্রাসাদের কঙ্কালের যেমন ক্রমশঃ রূপ দিতে লাগিল, রাজমিস্ত্রিরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কংক্রীট ঢালিয়া প্রাসাদের প্রাচীরগুলি, সোপানশ্রেণী, ছাদ মেঝে ইত্যাদি গাঁথিয়া চলিল। রাজমিস্ত্রির পরেই ছুতারের দল পূর্ব্ব হইতে নির্ম্মিত কাঠের অংশগুলি আঁটিতে লাগিয়া গেল। তাহার পর ক্রমশঃ ইলেক্‌ট্রিকের লাইন, জলের নল, গ্যাসের পাইপ, গরম জলের নল ইত্যাদি প্রাসাদময় বেড়িয়া বেড়িয়া উঠিতে লাগিল। পরে প্রাসাদের উচ্চতম তলায় অক্লেশে উঠানামার জন্য কয়েকটি লিফ্‌ট বসিল; গরম জল যোগাইবার জন্য বয়লার বসিল এবং প্রাসাদের সকল বাথরুমে অবিরাম জল যোগাইবার জন্য শক্তিশালী পাম্প বসিল। ক্রমশঃ সহস্র সহস্র কারিগরের সমবেত পরিশ্রমে প্রাসাদটিকে সহস্র প্রকার সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আরামপ্রদ করিয়া তোলা হইল।

বৃহত্তম প্রাচীর চিত্র

এইরূপ উপায়েই নিউইয়র্ক নগরীর ১০৪৬ ফুট উচ্চ ৭৭ তলা ক্রীস্‌লার বিল্ডিং নামে প্রাসাদটি মাত্র ১৬ মাসের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া মানুষের বাসোপযোগী করিয়া তোলা হয়। এই প্রাসাদটিতে উঠানামার জন্য ৩০টি লিফ্‌ট আছে। ইহার সাধারণ বৈঠকখানার সিলিংটিতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাচীর চিত্র অঙ্কিত করা হয়। এই চিত্রটি ১১০ ফুট দীর্ঘ এবং ৯৭ ফুট বিস্তৃত। মানুষ কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি বশে আনিয়াছে তাহাই রূপকের সাহায্যে এই অদ্ভুত চিত্রটিতে দেখান হইয়াছে।

বৃহত্তম বিমান (Aeroplane)

জর্ম্মণীর Dox নামক বিমানটি এই সম্মানের অধিকারী। ইহার বারটি ইঞ্জিন যখন সরোষে গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশ পথে শতাধিক যাত্রী ও লস্কর লইয়া ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে তখন যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। এইরূপ অবস্থায় ইহার ওজন পঞ্চাশ টনেরও (এক টনে ২৭॥ প্রায় মণ) অধিক। মাটিতে নামিবার সময় ইহা ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে নামে। এই অদ্ভুত আকাশবিহারী রথটি তিন তলা। সর্ব্ব নিম্নে থাকে পেট্রোল ট্যাঙ্ক, ভাঁড়ার ঘর ও মিস্ত্রির কারখানা। দ্বিতীয় তলে থাকে, রান্নাঘর, ঘুমাইবার খাটগুলি, খাইবার ঘর, লাইব্রেরী ও মদের ভাঁড়ার। তৃতীয় তলে প্যারাসুট্‌গুলি রাখিবার ঘর, বেতারে সংবাদ আদান প্রদানের ঘর, বিমান চালকের ঘর এবং কাপ্তেনের কেবিন। এই বিমানে প্রাসাদের সকল আরামই পাওয়া যায়, ইহাতে যাতায়াত করিবার সময় মনে হয় যাদুবলে একটি উড়ন্ত প্রাসাদে বাস করিতেছি। ইহার বল নাচের ঘরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ ফুট। এই বিস্তৃত নাচঘরটি এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে উহা অল্লায়াসেই ঘুমাইবার বা খাইবার ঘরে পরিণত করিতে পারা যায়। মেঘের উপরে উড়িতে উড়িতে

যাইবার কালে নৃত্য-বিলাসও বাদ পড়িবে না, এরূপ কথা আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ অতিকায় বিমানের ইঞ্জিনগুলির জন্য বিস্তর তৈলের প্রয়োজন হয়; সেই জন্য বহুদুর উড়িবার জন্য তৈল লইলে অধিক যাত্রী লেওয়া চলে না। সকল ইঞ্জিনগুলি একসঙ্গে না চালাইয়া কয়েকটি বন্ধ করিয়া রাখিলে বিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫০ মাইল হইতে কমিয়া ১০০ মাইলে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু কম তৈলের প্রয়োজন হয়। ইহা পূর্ণ যাত্রী সংখ্যা লইয়া উড়িলে এক সঙ্গে ৬০০ মাইল উড়িবার মত তৈল লইতে পারে। ইহার পর কোন বিমান ষ্টেশনে ইহা নামিয়া তৈল পূর্ণ করিয়া লইয়া পুনরায় আকাশ পথে যাত্রা আরম্ভ করে। এই বিমানে কাপ্তেন মিস্ত্রি, পাইলট ইত্যাদি লইয়া মোট ১২ জন কর্ম্মচারী থাকে।

বৃহত্তম দূরবীক্ষণ

দূরবীক্ষণের কাজ দূরের অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্টতর করিয়া দেখান। মহাকাশের গভীরতম কোনে লুকান বিশ্বগুলিকে আমাদের চক্ষে স্পষ্ট করিয়া ধরিরার জন্য অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণের প্রয়োজন। কোন জিনিস দেখিতে হইলে সেই জিনিস হইতে আলো আমাদের চক্ষে স্পষ্টভাবে পৌছান চাই। কিন্তু অন্তহীন মহাকাশের গভীরতম প্রদেশস্থ কোন বস্তু আলো বিকীরণ করিলে সেই আলো কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ছুটিয়া যখন আমাদের চক্ষে আসিয়া পৌছায় তখন এত ছড়াইয়া পড়ে যে উহাকে বহু চেষ্টা সত্ত্বে আমাদের চোখের দুর্ব্বল যন্ত্র ধরিতে ধরিতে পারে না। দূরবীক্ষণের কাজ এই ধারণাতীত দূর হইতে আগত মহাকাশব্যাপ্ত অতি ক্ষীণ আলোক এক স্থানে জড় করিয়া আলোকের উৎসটিকে স্পষ্ট করিয়া তোলা।

যে দূরবীক্ষণের এই মহাকাশস্থ ক্ষীণতম আলোক জড় করিবার যত বেশী শক্তি, সেটি তত শক্তিশালী। আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের উইল্‌সন গিরিস্থ মানমন্দিরের (**Mount Wilson Observatory**) দূরবীক্ষণটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ইহার আলো ধরিবার কাঁচটির ব্যাস ১০০ ইঞ্চি এবং

১৩ ইঞ্চি স্থূল। এই কাঁচটির ওজন সাড়ে চারি টন। ইহা ফ্রান্সের সেণ্ট গোবেন (St. Gobain) নামক কাঁচের কারখানায় প্রস্তুত হয়। তিন বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার পর এইরূপ একখানি নিখুঁত কাঁচ ঢালিতে পারা গিয়াছিল।

তাহার পর অতি যত্নে প্যাক করিয়া ইহাকে সাগর পারে পাঠান হইল। অকুস্থানে ইহা পৌছিলে সাত বৎসর ধরিয়া অতি সাবধানে মাজা ঘসা চলিবার পর এই কাঁচখানিতে মসলা মাখাইয়া ইহাকে বৃহত্তম অবতল (concave) লেন্সে (lens) পরিণত করা সম্ভব হইল। যে লোহার কঙ্কালে এই লেন্সটি আঁটা হইল উহার ওজন প্রায় ২৭০০ মণ। এইরূপ বিষম ভারী যন্ত্রটিকে কিন্তু জ্যোতিষীর হস্তের অতি সামান্য স্পর্শেই তাঁহার ইচ্ছামত ঘুরান চলে। এই বিশাল শক্তিশালী দুরবীক্ষণ যন্ত্রটি যে লৌহনির্ম্মিত গোল প্রাসাদে রাখা হইয়াছে, উহার ওজন ৫০০ টন। এই প্রাসাদের চন্দ্রাতপটি গোলাকার ও অবতল (concave)। এই গোলাকার চন্দ্রাতপটির প্রতি অংশটি ইচ্ছামত সরাইয়া দুরবীক্ষণে আকাশ দেখিবার পথ করা যাইতে পারে। এইরূপে জ্যোতিষী এক স্থানে বসিয়াই বিশাল যন্ত্রটিকে ইচ্ছামত অনায়াসে সরাইয়া মহাকাশের যে কোন অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। এই দূরবীক্ষণে যে সকল বিশ্বের আলো ধরা পড়ে উহাদের আলো পনর কোটি বৎসর অবিরাম মহাকাশে ছুটিলে তবে আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতে পারে। এরূপ দূরত্ব ধারণা করা যায় না।

সন্ধানী আলো (Searchlight)

বর্ত্তমান কালে যুদ্ধের প্রয়োজনানুরোধে সন্ধানী আলোর বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উজ্জ্বলতম সন্ধানী আলো হইতে দেড়শত কোটি বাতির তীব্র আলোক শিখা পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। এই আলোকশিখা দেড়শত মাইল দূর হইতেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ তীব্র জ্যোতি আলোক শিখার কল্পনাও লোকে করিতে পারিত না। সন্ধানী আলোতে ইলেক্‌ট্রিক বা য়্যাসিটেলিন গ্যাসের বাতি জ্বালা হয়। তাহার পর কয়েকখানি

স্যুজ দেহ কাঁচের সাহায্যে এই আলোকশিখাকে দূরে ফেলা হয়। বর্ত্তমানের সামরিক সন্ধানী-আলোকগুলি অত্যন্ত ভারী হইলেও এমন ভাবে গঠিত যে ইহার মুখ ইচ্ছামত অনায়াসেই ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়।

রেল ইঞ্জিন—সেকালের ও একালের

"রকেট"-নির্ম্মাতা জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন সাহেব আজ যদি হঠাৎ আবির্ভূত হন, তিনি তাঁহার উদ্ভাবনের অভূতপুর্ব্ব উন্নতি দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রকেটের ওজন ছিল ৭ টন. ৯ হন্দর এবং দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২০ ফুট। ইহার পিষ্টন আনা-গোনার দুই পাশের বাষ্পপাত্র দুইটির (cylinders) ব্যাস ছিল মোটে ৮ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৭ ইঞ্চি। ইহার বয়লার-মধ্যস্থ ২৫টি নলের তাপ লাগিবার ক্ষেত্রফল ছিল মাত্র ১১৮ বর্গফুট। ইহার ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ডটির ক্ষেত্রফল ছিল মাত্র ২০ বর্গফুট। ইহার বাষ্পের চাপ ছিল প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মাত্র ৫০ পাউণ্ড (অর্দ্ধ সেরে এক পাউণ্ড)। তাহা সত্ত্বেও সেকালে এই ক্ষুদ্র রকেটেই ছিল পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সেকালের বামন ইঞ্জিনের সহিত একালের দৈত্যগুলির তুলনাই চলে না। বিলাতের ইঞ্জিনগুলি নানা কারণে অতিকায় করিবার উপায় নাই, তাহা সত্ত্বেও 'রকেটে'র তুলনায় এইগুলি এক একটি দৈত্য বিশেষ। এইরূপ ইঞ্জিনের ওজন কয়লা ও জলের গাড়ীর ভার শুদ্ধ ১৫৮ টন ১২ হন্দর এবং দৈর্ঘ্য ৭৪ ফুট ৪॥০ ইঞ্চি। বয়লারের নলগুলির তাপ গ্রহণ করিবার সমষ্টি ক্ষেত্রফল ২,৫২৩ বর্গফুট। অগ্নিকুণ্ডটি ১৯০ বর্গফুট এবং যে অংশে গিয়া বাষ্প অতিরিক্ত তাপিত হয় (Super-heater) উহার ক্ষেত্রফল ৩৭০ বর্গফুট। মিলিত নলগুলির তাপ সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় তিন সহস্র বর্গফুটেরও অধিক। বাষ্পপাত্র হইতে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ২৫০ পাউণ্ড চাপে গিয়া বাষ্প সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে।

এই সকল ইঞ্জিনে চারিটি করিয়া সিলিণ্ডার থাকে, সেইজন্য চারিটি সিলিণ্ডারে চারিটি পিষ্টন চালাইবার জন্য প্রচুর বাষ্পের প্রয়োজন। ইঞ্জিনের

অনুপাতে বয়লারও সেইরূপ করিতে হয়। এইরূপ বয়লারের ব্যাস ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। ইহার মধ্যে সাধারণ তাপ গ্রহণের জন্য ২॥০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ২০ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ ১৭০টি ইস্পাতের নল আছে। ইহা ব্যতীত অসাধারণ তাপসংগ্রহের জন্য (Superheater) ৫॥০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ৬টি ঐরূপ দীর্ঘ ইস্পাতের নল থাকে। অগ্নিকুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ৮॥০ ফুট ও প্রস্থে ৭ ফুট।

রাশিয়ার বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত বিশাল দেশে ভারি গাড়ীর দীর্ঘ সারিগুলি সুদীর্ঘ পথ টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী ইঞ্জিনের প্রয়োজন হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ার জন্য একটি অতিকায় ইঞ্জিন বিলাতে নির্ম্মিত হয়।

ইহার আগু-পিছু দুইটি গাড়ীতে দীর্ঘ পথের প্রয়োজনের জন্য কয়লা ও জল বহন করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০৯ ফুট। ইহার ওজন ২৬০ টন এবং ইহা ২৫০০ টন মাল টানিয়া লইয়া দীর্ঘ পথ ছুটিতে পারে। পথের বিষম বাঁকগুলি নিরাপদে কাটাইয়া ছুটিবার জন্য এইরূপ দীর্ঘ ইঞ্জিনটিকে ছোট ছোট তিনটি খণ্ডে ভাগ করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে জল ও কয়লার জন্য দশ চাকার গাড়ী, মাঝে ইঞ্জিনটি আটটি চাকার উপর বসান এবং শেষে আর একখানি জল ও কয়লার জন্য দশ চাকার গাড়ী। আগুপিছু গাড়ী দুটিতে চারিটি সিলিণ্ডার লাগান আছে। ইহার বিশাল বয়লারে অত্যধিক চাপে বাষ্প জন্মাইয়া চারিটি পিষ্টন চালান হয়। ইহার ফলে যে শক্তি জন্মে, উহা একশত গাড়ী মাল বোঝাই করিয়া খাড়াই পথ ভাঙ্গিয়া অবিরাম ছুটিতে পারে।

বিলাতের পার্লামেণ্টের ঘড়ি

এই ঘড়ি বিগ্ বেন (Big Ben) বলিয়া খ্যাত। ভূমি হইতে ৩২০ ফুট উচ্চে টাঙ্গান থাকায় ইহার কাঁটাগুলি তত বড় দেখায় না। এই ঘড়িটি চতুর্ম্মুখ, প্রতি মুখের ব্যাস ২৩ ফুট। ইহার তাম্রনির্ম্মিত মিনিটের কাঁটাগুলি ১৪ ফুট

দীর্ঘ ও প্রত্যেকটি ওজনে দুই হন্দর। এক বৎসরে প্রতি কাঁটাটিকে একশত মাইল ঘুরিতে হয়।

ইহার ঘণ্টার কাঁটাগুলির প্রত্যেকটি ৯ ফুট দীর্ঘ, কিন্তু মিনিটের কাঁটার অপেক্ষা ভারী। দোলকটি (pendulum) ১৩ ফুট দীর্ঘ এবং ইহার বলটি ৪ হন্দর ভারী। ঘড়িটি প্রায় আড়াই টন ভারী। এইরূপ অতিকায় ঘড়ি হাতে দম দেওয়া যে কত আয়াসসাধ্য ছিল তাহা বলাই বাহুল্য, এখন বিজলী শক্তির সাহায্যে উহার দম দেওয়া অতি সহজ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে।

ঘণ্টানির্দ্দেশক ধ্বনি যে ঘণ্টাটিতে বাজিয়া উঠে, উহার ওজন প্রায় ১৩॥০ টন এবং যে হাতুড়ি এই বিশাল ঘণ্টায় আঘাত করে উহার ওজন চারি হন্দর। ইহাতে কেবলমাত্র ঘণ্টার সময় নির্দ্দেশ করে; ইহা ব্যতীত সিকি-ঘণ্টা বাজিবার চারিটি ছোট ছোট ঘণ্টারও ব্যবস্থা আছে। ইহাদের মিলিত ওজন প্রায় আট টন।

এই ঘড়িটির শব্দ কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে কলিকাতাতেও বেতার সাহায্যে ছড়ান হয়, অনেকেই বোধ করি ইহার শব্দ শুনিয়া থাকিবেন। এই ঘড়িটি পৃথিবীতে বৃহত্তম না হইলেও উহা যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ঘড়ি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা খুব সঠিক সময়ও নির্দ্দেশ করে, কদাচিৎ মাত্র এক আধ সেকেণ্ডের প্রভেদ ধরা পড়ে।

উচ্চতম লৌহনির্ম্মিত স্তম্ভ

প্যারিস নগরীর ইফেল টাওয়ার (Eiffel Tower) পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ লৌহনির্ম্মিত স্তম্ভ। ১৮৮৯ সালে প্যারিস্ প্রদর্শনী অধিকতর আকর্ষণের বস্তু করিবার জন্য ইফেল সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা ভূমি হইতে ৯৮৪ ফুট উচ্চ। ইহা চারিটি স্তরে নির্ম্মিত। খুব দৃঢ় কংক্রীটের ভিত্তি গাঁথিয়া উহার উপরে প্রথম স্তরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। চারিটি সুবৃহৎ লৌহ নির্ম্মিত খিলানের

উপর একটি বৃহৎ মাচান (platform) গাঁথিয়া প্রথম স্তরটি গঠন করা হইয়াছে। চারিটি খিলানই স্তম্ভের চারিটি বিশাল পদ।

তাহার পর দ্বিতীয় তলাটি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাই ইহার দীর্ঘতম অংশ। এইটি লৌহের ছোট ছোট বহু পাটি একটির সহিত অপরটি আঁটিয়া নির্ম্মিত হওয়ায় দূর হইতে জাফরির (Lattice work) কাজের মত দেখায়। এই বিশাল লৌহ-জাফরির উপরে দ্বিতীয় তলের ছাদ। তাহার পর তৃতীর স্তরটি আরম্ভ হইয়াছে। তৃতীয় স্তরের শীর্ষদেশে বাতিঘর।

স্তম্ভটি পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শীর্ষদেশে গিয়া সরু হইয়া গিয়াছে। আজকাল লিফ্‌টে চড়িয়া ইহার শীর্ষদেশে উঠিতে পারা যায়। মাঝে কথা উঠিয়াছিল যে প্রদর্শনীর পর উহার কোন সার্থকতা নাই, সেইজন্য উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক ; কেননা উহা কোনদিন নিজের বিশাল ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অনর্থ উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু বেতারের উন্নতি হওয়ায় ঐ উচ্চ স্তম্ভের বিশেষ প্রয়োজন থাকায় উহাকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ স্তম্ভ হইতে বেতারে সংবাদ বিশ্বে ছড়ান হয়।

ইফেল সাহেব স্বনির্ম্মিত এই স্তম্ভটি এত ভালবাসিতেন যে স্তম্ভের এক অতি উচ্চ স্তরে একখানি ঘরে তিনি মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাস করিতেন।

বৃহত্তম জাহাজ

গত মহাযুদ্ধে হারিয়া যাওয়ায় জার্ম্মণী মিত্রশক্তিকে যে ক্ষতিপূরণ দিয়াছিল উহার মধ্যে তাহাদের তিনটি সুবৃহৎ জাহাজ ছিল। এই জাহাজ তিনটির একটি ইংরাজ লইয়া নাম দিল ম্যাজেষ্টিক (Majestic)। ইহা দৈর্ঘ্যে ৯৫৬ ফুট ও প্রস্থে ১০০ ফুট। ইহার খোলের গভীরতা ১১২ ফুট। ইহা সর্ব্ব শুদ্ধ ৫৬০০০ টন মাল বহন করিতে পারে এবং ইহার টারবিনগুলির (ইঞ্জিন) একলক্ষ অশ্ব শক্তি প্রয়োগে চারিটি বিশাল কলের পাখা (Propellers) চালাইয়া জাহাজটি লইয়া ছুটে।

আজকাল অবশ্য ইহাপেক্ষাও বড় বড় জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংরাজের নূতন জাহাজখানি আশী হাজার টন মাল বহিয়া সমুদ্র পারাপার হইতে পারে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যে জাহাজখানি সম্পূর্ণ হওয়ায় উহাকে আমেরিকায় চুপি চুপি লইয়া গিয়া নিরাপদে রাখা হইয়াছে। ফরাসীর নূতন জাহাজখানিও অনুরূপ। ইহা বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমুদ্র পারাপার করিতেছিল।

এইরূপ অতিকায় জাহাজগুলির সঠিক ধারণা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহার বিশাল অগ্নিকুণ্ডের ধূম বাহির হইবার ফানেলগুলি মাটিতে শোয়াইয়া রাখিলে উহার মধ্যে দুইটি মোটর গাড়ী পাশাপাশি অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। মাস্তুল ও ফানেলগুলি বাদ শুধু খোলের গভীরতাই ১১২ ফুট। কাপ্তেনের কেবিন হইতে দেখিলে নীচের মানুষগুলিকে পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র মনে হয়। লিফ্‌টে উঠা-নামা করিতে হয় এবং মাল বোঝাই বা খালাস করিবার জন্য বহু ক্রেণ ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নাই। জাহাজ যখন সহস্র সহস্র যাত্রী লইয়া সমুদ্রে ছুটে তখন বেতার যন্ত্রে সংবাদ ধরিয়া প্রতিদিন একখানি খবরের কাগজ জাহাজেই ছাপা হয়। মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এত বিপুল ব্যবস্থা আছে যে জাহাজে বাস করিবার কালে মনে হয় কোন মহানগরীর এক বিখ্যাত হোটেলে বাস করিতেছি। এইরূপ অতিকায় জাহাজগুলি এত কম দুলে যে সমুদ্রে সামান্য ঝড় উঠিলে বলরূমে সাহেব-মেমদের নাচ বন্ধ হয় না।

জাহাজে প্রথম শ্রেণীর সিনেমা, রেস্তোরাঁ, টেনিস কোর্ট, সাঁতার দিবার পুষ্করিণী ইত্যাদি নগরের যত রকমের বিলাস-ব্যসন সম্ভব উহার কোনটির অভাব নাই।